www.AmarIslam.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- মারেফতের গোপন ভেদ
- মেশকাতুল আনওয়ার
- সিরাতুল মুস্তাকিম
- সিররুল আসরার
- ক্বিসতাসুল মুস্তাক্বীম
- দেওয়ানে শামসে তাবরীজ
- সূফীবাদের মর্ম বাণী
- কাসীদাতুল গাওসীয়া
- মালফুজাতে গাওসুল আযম
- আনিসুল আরোয়া
- জান্নাতের বর্ণনা
- জিয়াউল ক্বুলুব
- রাহাতিল মুহিব্বিন
- ফাওয়ায়েদুল ফোহাদ
- রাহাতিল কুলুব
- কাসীদা-এ-বোরদা
- তালিমে মারেফত
- খাইরুল মাজালিস
- মিনহাজুল আবেদীন
- মাকতুবাত শরীফ
- কাশফ ও কারামত
- মুমিনের জিন্দেগী
- সিয়াম সাধনা
- কাশফুল মাহজুব

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১

অসিলা ও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ ● সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

حُجِّيَّةُ التَّوَسُّلِ وَالْاِسْتِغَاثَةِ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন-হাদীসের আলোকে

অসিলা ও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ

সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

حُجِّيَّةُ التَّوَسُّلِ وَالْاِسْتِغَاثَةِ عَلَى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন-হাদীসের আলোকে

অসিলা ও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ

লেখক

সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

[বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক]

প্রকাশনায়

রশীদ বুক হাউস

৬ নং প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে

অসিলা ও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ

সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
Mobile: 0174-1010457

প্রকাশক
আব্দুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬ নং প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
Mobile: 01913-493311

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অগাস্ট, ২০১৩ইং

মূল্য: ২৪০.০০ টাকা মাত্র।

অক্ষর বিন্যাস
জে.পি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মেরাজ প্রিন্টার্স, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

ভূমিকা (Preface)

Hamd be Allah Taala peace & Blessings be on Rasulullah The Prophet Muhammad (P.B.U.H) Benedictions be over his pure Ahlebait & overall his just & devoted companions (R).

কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে আমরা ইসলামি সঠিক আকীদার বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছি। আকীদা বিশুদ্ধ না হলে কোন আমলই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, বিশুদ্ধ আকীদার উপরই পরকালের নাজাত নির্ভরশীল। কিতাবের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা অসিলা, সাহায্য চাওয়ার শরয়ী বিধান ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কুরআন-হাদীসের আলোকে উল্লেখ করেছি। বর্তমানে বহু আলেম, পীর, শায়েখ, ইসলামীদল ইত্যাদি নামধারী ধোকাবাজ ঈমান চোর বের হয়েছে– যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের মনগড়া ভুল অপব্যাখ্যা দিয়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের ধর্মচ্যুত করছে। আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে সেইসমস্ত ধোকাবাজ ও ঈমান চোরদের থেকে যাতে করে তারা কাউকে ধোকা দিয়ে ঈমান হারা করতে না পারে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিতাবটি অধ্যায়ন করলে আশা করি সকলেই উপকৃত হবেন।

বিনীত
লেখক

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী কর্তৃক প্রণীত "কুরআন-হাদীসের আলোকে **অসিলা ও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ**" পুস্তকটি আমার কাছে খুবই চমৎকার মনে হয়েছে বিধায় আমি পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

পুস্তকটিতে লেখক বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়গুলো নিয়ে পৃথিবীতে নানারকমের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করছে বদ-মাজহাবপন্থীরা এবং সরল প্রাণ মুসলিমদের ঈমান হারা করছে, এ পুস্তকের মাধ্যমে লেখক উক্ত বদ-মাজহাবীদের দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন। সরলপ্রাণ মুসলিম ভাই-বোনগণ এ কিতাব পাঠে খুবই উপকৃত হতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

পুস্তকটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী খুবই উপযোগী হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিম এ পুস্তক পাঠে নিজেদের ঈমানকে হেফাজত করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

পাঠকবৃন্দের ব্যাপক উপকারে আসবে বলে আমরা পুস্তকটি প্রকাশ করলাম। আশা করি আমাদের এই প্রয়াশ বৃথা যাবে না।

বিনীত

প্রকাশক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

-: সূচিপত্র :-

প্রথম অধ্যায়

আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাসের বর্ণনা ৭
বিশ্বাসের বর্ণনা ১৫
আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসিলা তথা সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ ৪১
পবিত্র কুরআন থেকে অসিলা ৪১
استغاثة (ইস্তিগাসা)-এর আভিধানিক অর্থ ৪২
استغاثة বা সাহায্য প্রার্থনা দু'ভাবে হয়ে থাকে ৪৯
استغاثةبالقول-মৌখিক সাহায্য চাওয়া ৪৯
استغاثةبالعمل-কর্মের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া ৫০
استغاثة ও توسل-এর মধ্যকার সম্পর্ক ৫১
পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে অসিলা ৫১
দুআ ৬২
ইবাদত ৭২
ইবাদতের শর্ত ৭৩
ইবাদতের প্রকারভেদ ৭৭
استغاثة ও دعا-এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য ৮০
সূরা ফাতিহা ও সাহায্য চাওয়ার বিধান ৮০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাহায্য চাওয়ার বিধান ৮৩
হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের যুগের আলোকে 'সাহায্য প্রার্থনা' ৮৫
হজরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহায্য কামনা ৮৭
একজন সাহাবীর বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা ৮৯
মৃত্যুর পর সাহায্য চাওয়ার বৈধতা ৯১
কবর-জীবন সম্পর্কিত প্রমাণ ৯৪
"রূহ"-এর হায়াত ও ক্ষমতার আলোচনা ৯৯

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাকীকত ও মাজাযের স্বাতন্ত্র্যতা জরুরি ১০১
অলৌকিক বিষয়ে রূপকের বৈধতা ১০২
জিবরাঈল (আ)-এর ঘটনা ১০৩
অহেতুক আকিদাগত ফিতনার খণ্ডন ১০৪
একটি ভুল ধারণার অপনোদন ১০৬
মাখলুকের নিকটও দূরের ইল্‌ম থাকতে পারে ১০৭
কাশ্‌ফে ফারূকী ১০৮
কাশ্‌ফ ও ইলমে গায়েবের মাঝে প্রভেদ ১০৯
নবীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির যোগ্যতার দলিল ১১০
আল্লাহ ব্যতীত কোনো সাহায্যকারী নেই ১১৪
অসার প্রমাণ উপস্থাপন ১১৫
প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা কেবল আল্লাহর কাছেই বৈধ ১১৭
প্রার্থনা আল্লাহ পাকের নির্দেশ ১১৮
আরো কিছু চাও ১২০
সাহায্য-প্রার্থনা খোদ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ১২১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য-প্রার্থনার নিষেধাজ্ঞা ১২৪
হাদীস শরীফটির প্রকৃত অর্থ ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর ওলীগণের অসিলা গ্রহণের প্রতি উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ ও সেগুলোর জবাবাদি ১২৭
'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে ডাকা বা 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' শীর্ষক শ্লোগান প্রসঙ্গ ১৪৬
'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে ডাকার দলিল ১৪৬
'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাব ১৫২
কুফর ১৬৩
শিরক ১৬৯
বিদয়াতের সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ ১৮৪
বিদয়াত দু'প্রকার– হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ ১৮৬
সকল বিদয়াত সাইয়্যেয়াহ নয় ১৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম অধ্যায় :----------

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাসের বর্ণনা

আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে আকিদা হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে, কোনো আমলই কাজে আসবে না। আপনি নিজেকে যতবড় জ্ঞানী, পরহেজগার, মারেফাতপন্থী, ওলী, ইত্যাদি মনে করেন না কেন, আকিদা বিশুদ্ধ না হলে সব বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি নিজেও বরবাদ হয়ে যাবেন। আজকাল অনেক ছদ্মবেশী মুসলমান বের হয়েছে যারা নিজেদের আলেম, পীর, শায়েখ, শাহ-সাহেব, ইসলামি দলের লোক ইত্যাদি বলে দাবি করে। আদতে ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। অনেক অজ্ঞ মুসলমান তাদের ধোঁকায় পড়ে ধর্মচ্যুত হচ্ছেন। আপনি যখন জানতে পারবেন সেই আলেম, পীর, শায়েখ বা ইসলামি দলের আকিদা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বিপরীত– তখনই সাথে সাথে তাদের ত্যাগ করবেন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত কাদের বলে, এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী ইসরাইল (আকীদা বিশ্বাসে) বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এদের সকলই জাহান্নামে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন দল? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যে আদর্শের ওপর আছি তারা ওই আদর্শের উপর থাকবে। (তিরমিজি শরীফ)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিম্নে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো:

কালেমায়ে তাইয়্যেবায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা: কালেমায়ে তাইয়্যেবা–

لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

দুটি বাক্যের এই কালেমার দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। এর প্রথমাংশে তাওহীদ এবং দ্বিতীয়াংশে রেসালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম প্রথমাংশের কতেক বিষয় সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

প্রথম বিষয়: তাওহীদ বা একত্ববাদ: জানতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা একান্তই এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি পরম একক। তাঁর মধ্যে কেউ নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, আদি, অনন্ত, তিনি সদা বিরাজমান, তাঁর শেষ নেই। তিনি অক্ষয়-অব্যয়। তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যের গুণাবলি দ্বারা সদা গুণান্বিত রয়েছেন ও থাকবেন। তিনি সবার প্রথম এবং সবার শেষ। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য।

দ্বিতীয় বিষয়: পবিত্রতা: বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা নিরাকার, তার কোনো আকার নেই। তিনি সীমিত বা পরিমাণবিশিষ্ট বস্তু নন, বিভাজ্য বস্তু নন। অন্য কোনো কিছুর মত দেহবিশিষ্টও নন। কোনো দিক দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত নন। আসমান ও জমিন তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, তিনি আরশে আজীমের উপরে এমনভাবে অবস্থিত, যেমন তিনি নিজে বলেছেন এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছে করেছেন আরশ তাঁকে বহন বা ধারণ করে না; বরং আরশ ও আরশ বহনকারীদের তাঁর কুদরত বহন করছে। সবকিছুই তাঁর কুদরতের অধীন। তাঁর অবস্থান এমনভাবে যে, তিনি আরশের বেশি নিকটে এবং দুনিয়া থেকে দূরেও নন। তাঁর মর্যাদা তাঁর নৈকট্য ও দূরত্ব অপেক্ষা অনেক উপরে। তিনি সময়ের পরিবেষ্টনী থেকেও মুক্ত। তিনি স্থান ও কালের বেষ্টনীমুক্ত। তিনি নিজ গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলে সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক। তিনি পরিবর্তন এবং স্থানান্তর থেকে সম্পূর্ণ

মুক্ত। তিনি স্থান ও কালের বেষ্টনীমুক্ত। তিনি নিজ গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলে সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক। তিনি পরিবর্তন এবং স্থানান্তর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি যেকোনো রকম ক্ষয়, হ্রাস ও পতন থেকে পবিত্র। বেহেশতে নেককারদের প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, তাঁর পবিত্র দিদারের আনন্দ পূর্ণ করার জন্য তিনি স্বীয় সত্তাকে মানুষের জন্য চর্মচক্ষে দেখার তওফিক দান করবেন।

তৃতীয় বিষয়: জীবন ও কুদরত: অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ জীবিত এবং ক্ষমতাবান মহাপ্রতাপশালী। তিনি সর্বপ্রকার শ্রান্তি ও ক্লান্তি শূন্য। তাঁর অবসাদ-অবসন্নতা নেই। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর মৃত্যু বা অচৈতন্য নেই। আসমান ও জমিনের সাম্রাজ্য শুধু তাঁরই। ইজ্জত, মর্যাদা, সম্মান, আধিপত্য, প্রাধান্য, শক্তিমত্তা একমাত্র তাঁরই। শূন্য জগৎ (আকাশমণ্ডলী) তাঁর ডান হাতে আবদ্ধ এবং যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই, তাঁর সৃষ্ট বস্তু অসংখ্য- অগণিত। তাঁর জানা বিষয়ের কোনো শেষ নেই।

চতুর্থ বিষয়: ইলম: অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নখদর্পণে, দুই জগতের একটি পরমাণুও তাঁর কাছে অদৃশ্য নয়; বরং গভীর রাতের অন্ধকারে কুচকুচে কাল পাথরের একটি কাল বর্ণের ক্ষুদ্রকীটের ধীর পদক্ষেপ এবং ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র ধূলিকণার গতিবিধিও তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পান। তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানতে পারেন এবং অন্তরের সমস্ত কুমন্ত্রণা ও যেকোনো গোপন রহস্য জানেন। তাঁর ইলম অনন্ত অপরিসীম। তাঁর ইলম ও জ্ঞানরাশি বাইরের কোথাও থেকে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেনি; বরং সবই তাঁর নিজস্ব।

পঞ্চম বিষয়: ইচ্ছা: অর্থাৎ, এমন বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখন যা ইচ্ছে করেছেন, তখনই তা হয়েছে, যা ইচ্ছে করেননি, তা হয়নি। চোখের পলকে কোনো বিপদ-আপদ আসাও তাঁর ইচ্ছের বাইরে নয়। তিনি স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যখন যে আদেশ করেন, তা খণ্ডন করার কেউ নেই। তাঁর ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তকৃত কোনো কিছু স্থগিত করার মত কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই। তাঁর তওফিক ব্যতীত বান্দার জন্য নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই এবং তাঁরই ইচ্ছে

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যতীত তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করার কারো শক্তি বা সমর্থ্য নেই। যদি সমস্ত জিন, মানব, ফেরেশতা, শয়তান একত্র হয়েও দুনিয়ার কোনো একটি পরমাণুকে তাঁর ইচ্ছে বা নির্দেশ ব্যতীত গতিশীল বা স্থিতিশীল করতে চেষ্টা করে তবে তা তাদের জন্য কখনও সম্ভব হবে না। তাঁর এ ইচ্ছেশক্তিও তাঁর অন্যান্য গুণের মত সহজাত। তাঁর কোনো অবস্থা তাকে অন্য কোনো অবস্থা থেকে অমনোযেগী বা উদাসীন করে না।

ষষ্ঠ বিষয়: শ্রবণ ও দর্শন: অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। কোনো শোনার বিষয়, তা যতই গোপন, অস্পষ্ট, অনুচ্চ হোক এবং যেকোনো দেখার বস্তু তা যতই সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট হোক তা তাঁর শ্রবণ এবং দর্শনের বাইরে নয়। কোনো দূরত্ব, প্রাচীর বা পর্দা তাঁর শ্রবণ এবং দর্শনকে ঠেকাতে পারে না। তিনি সবকিছুই দেখেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁর চক্ষুকোটর ও পলকের প্রয়োজন হয় না। তিনি সবকিছুই শুনেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁর কর্ণকুহরের প্রয়োজন হয় না।

সপ্তম বিষয়: কালাম: এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা কথা বলতে পারেন এবং কথা বলেন। তিনি নিজস্ব কালামশক্তির দ্বারা সব আদেশ-নিষেধ করেছেন এবং যখন যা বলার তা বলেছেন। অবশ্য তাঁর কথাবার্তা সৃষ্ট প্রাণীর মত নয়, তাঁর কথা বলার জন্য মুখ, দাঁত, জিহ্বা, ঠোঁট প্রভৃতির দরকার হয় না। বরং তিনি এ জিনিসগুলোর মুখাপেক্ষিতামুক্ত। কুরআন মুখে পঠিত হয়। পৃষ্ঠায় লিখিত হয়, অন্তরে হেফজ বা অঙ্কিত হয়। তা সত্ত্বেও কুরআন নিত্য, অবিনশ্বর। আল্লাহ পাকের সত্তার সাথে চির প্রতিষ্ঠিত। হজরত মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালার কালাম এবং কণ্ঠস্বর অক্ষর ছাড়া শ্রবণ করেছেন।

অষ্টম বিষয়: কার্যকলাপ: অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর কর্ম দ্বারা সৃষ্টি এবং তাঁরই ইনসাফ দ্বারা কল্যাণপ্রাপ্ত। তিনি তাঁর সব ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময় এবং সব বিধিবিধানেই পরম ইনসাফদার। তাঁর ইনসাফ বান্দার ইনসাফ দ্বারা তুলনীয় নয়। কারণ, বান্দা অবিচার করতে পারে, অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে জুলুম বা বেইনসাফির কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, তিনি স্বয়ং-ই সবকিছুর মালিক। অন্যের

মালিকানা তিনি লাভ করেন না। মূলে অন্যের কোনো মালিকানাই নেই। সব মালিকানা একমাত্র তাঁরই। মোটকথা তিনি ছাড়া যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা, শয়তান আসমান, জমিন, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, জড়বস্তু, সবই তিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। এক সময়ে তিনি একাই বিরাজমান ছিলেন। তারপর তিনি স্বীয় কুদরত প্রকাশ করার লক্ষ্যে এবং নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এসব করার জন্য তিনি বাধ্য ছিলেন না। কৃপা, দয়া, অনুগ্রহ এবং নিয়ামতরাজি তাঁর জন্য শোভনীয় এবং তাঁর অনুগ্রহের ফল। এসব যদি তিনি কিছুই না করতেন, তবে তা তাঁর কোনো বেইনসাফি হত না। তিনি তাঁর বান্দাগণকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর কাছে কারও কোনো ওয়াজিব পাওনা নেই। যাকে যা কিছু তিনি দিয়েছেন, দিচ্ছেন, এবং দিবেন, সবই তাঁর দয়া ও রহমতের কারণে হচ্ছে; কিন্তু মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অবশ্যই তাঁর পাওনা। এ প্রাপ্য তাঁর জন্য ওয়াজিব। কেননা, তিনি মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলির দ্বারা তাঁদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন, পয়গাম্বরগণ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি ও নাফরমানির শাস্তির ঘোষণা মানুষের নিকটে পৌঁছিয়েছেন। অতএব পয়গাম্বরগণকে সত্য জানা ও তাঁদের প্রচারিত বিধি-বিধান অনুযায়ী চলা মানুষের প্রতি একান্ত আবশ্যক।

এ তো গেল প্রথমাংশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি। তারপর দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ, রেসালাতের সাক্ষ্যপ্রদান সম্পর্কেও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। সর্বপ্রথম বিষয় হল, এটা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ বংশের উম্মী নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সারা জগতের সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তকে রহিত করেছেন। তবে তার যে বিষয়গুলো বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলোর কথা ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাইয়্যিদুল মুরসালীন ও খাতামুল আম্বিয়া তথা সকল রাসূলের সরদার ও সকল নবীর শেষ নবী করেছেন। আল্লাহ তায়ালা শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, তাওহীদের সাক্ষ্যপ্রদানকেই পূর্ণ ঈমান সাব্যস্ত করেননি বরং এর

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাথে রাসূলের রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়াকেও আবশ্যক করেছেন। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ-পারলৌকিক যে বিষয়গুলোর সংবাদ দিয়েছেন তা মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ সংবাদ দেয়ার ব্যাপারে তাঁকে সত্যবাদী জানতে হবে। আল্লাহর দরবারে কোনো ব্যক্তির ঈমান গৃহীত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মৃত্যুর পরবর্তী বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করে, যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন ওগুলোর মধ্যে–

১. মুনকার-নকীরের সওয়ালে বিষয়। মুনকার-নকীর হল ভীষণাকৃতির দু'জন ফেরেশতা। এঁরা কবরে মৃত বান্দাকে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করে বসিয়ে দেন এবং তাকে তওহীদ ও রেসালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কী? তোমার নবী কে? এ ফিরিশতাদ্বয় কবরের পরীক্ষক। মানুষের মৃত্যুর পর কবরের এই জিজ্ঞাসাবাদই হল প্রথম পরীক্ষা।

২. একথা বিশ্বাস করা যে, কবরে শাস্তি হবে। এ শাস্তি আল্লাহ তায়ালা যাকে যেভাবে চাইবেন দেহ ও আত্মার উপর প্রদান করবেন।

৩. এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, আসমান-জমিনতুল্য বড় আকারের দুটো পাল্লা স্থাপন করা হবে, আল্লাহর কুদরতে ওই পাল্লায় ন্যায়বিচার যথার্থই প্রমাণিত হবে। নেক আমলসমূহ নূরের পাল্লায় রাখা হবে এবং নেক আমলসমূহের মর্তবা আল্লাহর দরবারে যত বেশি হবে, ততই আল্লাহর রহমতে তার পাল্লা ভারি হবে। আর মন্দ আমলসমূহ কুৎসিত আকারের পাল্লায় রাখা হবে এবং আল্লাহর ইনসাফ অনুযায়ী-ই তার পাল্লা হাল্কা হবে।

৪. এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, দোজখের উপরে তলোয়ারের চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম একটি পুল স্থাপিত রয়েছে। সবাইকে ওই পুল পার হতে হবে। আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশক্রমে পাপীরা পা কেটে পুলের উপর থেকে দোজখের মধ্যে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে, নেককার মুমিনগণ ওই পুল সহজে পার হয়ে বেহেশতে পৌঁছে যাবেন।

৫. বিশ্বাস করতে হবে, রোজ হাশরে মুমিন বান্দাগণ একটি হাওজের পাশ দিয়ে যাবেন। এটা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাউজ। বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে এবং পুলসিরাত পার হওয়ার পর মুমিনগণ এ হাউজের পানি পান করবেন। এই হাউজের এক চুমুক পানি পান করার পর কেউ কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এ হাউজের প্রস্থ এক মাসের পথ। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং এর স্বাদ মধু অপেক্ষা মিষ্ট। আকাশের তারকার সংখ্যা পরিমাণ পাত্র এর চারপাশে রক্ষিত থাকবে। বেহেশতের হাউজে কাওসার থেকে দুটো নালা দিয়ে পানি এসে এ হাউজে পড়তে থাকবে।

৬. রোজ কিয়ামতের হিসাবনিকাশে বিশ্বাস করা। কারও কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নেয়া হবে। কাউকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আবার কেউ একেবারে বিনা হিসাবে বেহেশতে চলে যাবে। এঁরা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা বলেই এমন হবে। পয়গাম্বরগণের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, রেসালাতের বিষয়বস্তু বান্দার নিকট পৌঁছানো হয়েছে কি না? নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করার ব্যাপারে কাফেরদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, বেদয়াতিদের সুন্নতের ব্যাপারে এবং মুসলমানদের তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।

৭. এরূপ বিশ্বাস করা যে, ঈমানদার গুনাহগারগণ শাস্তি ভোগের পর দোজখ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত একত্ববাদে বিশ্বাসী কোনো লোকই দোজখে থাকবে না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো ঈমানদারই চিরকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করবে না।

৮. শাফায়াতের বিষয়ে বিশ্বাস করা। প্রথমে শাফায়াত করবেন নবী-রাসূলগণ, তারপর আলিমগণ তারপর শহিদগণ, তারপর সব মুসলমান শাফায়াত করবেন। তাঁদের মধ্যে যার যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা, তাঁর শাফায়াত আল্লাহর দরবারে ততটুকু কবুল হবে। যে মুমিনের জন্য কোনো শাফায়াতকারী হবে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় পার করবেন। যে মুমিনের জন্য

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোনো শাফায়াতকারী হবে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় দোজখ থেকে বের করে আনবেন। সুতরাং, কোনো ঈমানদারই চিরকাল দোজখে থাকবে না। যার অন্তরে কণামাত্র ঈমান থাকবে, সে-ও দোজখ থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাবে।

৯. সাহাবায়ে কেরাম নবীর সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এরূপ– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন হজরত আবু বকর (রা), তারপর হজরত ওমর (রা), তারপর হজরত ওসমান (রা) এবং তারপর হজরত আলী (রা)।

১০. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মনে সুধারণা পোষণ করা, তাঁদের প্রশংসা করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলো হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং বুজুর্গগণের উক্তিসমূহ এগুলোর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হবে, সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে বিবেচিত হবে এবং তারা পথভ্রষ্ট ও বেদয়াতিদের থেকে আলাদা থাকবে। আল্লাহ আমাদের ও সকল মুসলমানকে পূর্ণ বিশ্বাস দান করুন এবং তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

বিশ্বাসের বর্ণনা

কালেমায়ে তাইয়্যেবা–

لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

বলা একটি ইবাদত। তবে এই বাক্যের মূল বিষয়গুলো না জানা পর্যন্ত শুধু মুখে এ কালেমা উচ্চারণ করায় কোনো সার্থকতা নেই। ওই মূল বিষয়গুলোই কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতিপাদ্য বিষয়। কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতিপাদ্য বিষয় এই চারটি। যথা:

১. আল্লাহ তায়ালার সত্তা
২. তাঁর গুণাবলি
৩. তাঁর কার্য-কলাপ এবং
৪. তাঁর পয়গাম্বরগণের সত্যতা সপ্রমাণ করা।

এ থেকে বুঝা গেল যে, ঈমান চারটি খুঁটির উপর ভিত্তিশীল। এর প্রত্যেকটি খুঁটি আবার দশটি মূল বিষয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথম স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ: এ সম্পর্কে কুরআনের বাণীই সর্বোত্তম। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে বলেন–

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً ـ وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ـ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً ـ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ـ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ـ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ـ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ـ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ـ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً ـ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً ـ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً ـ

অর্থাৎ, "আমি কি জমিনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেক সদৃশ করিনি? আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিনি? তোমাদের নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্য, রাত্রকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিনকে করেছি উপার্জনের সময়। আমি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সাত আকাশ নির্মাণ করেছি এবং সুমুজ্জ্বল প্রদীপ তৈরি করেছি। আমি সলিলবাহী মেঘমালা

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে প্রচুর বারিবর্ষণ করি, তদ্বারা আমি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান উৎপাদন করি।" (সূরা: আন-নাবা, আয়াত নং, ৬ থেকে ১৬)

কুরআনে পাকের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ـ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে, রাত্র ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য লাভজনক বস্তু নিয়ে সাগরে চলমান নৌকায়, আকাশ থেকে আল্লাহর বর্ষাণো পানিতে, যদ্বারা তিনি মৃতপ্রায় জমিনকে সজীব করেন এবং তাতে ছড়িয়ে দেন সব রকমের জীব-জন্তু, জলবায়ুর পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আয়ত্তাধীন আসমান ও জমিনের মধ্যে বিচরণকারী মেঘমালার মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা অনুধাবন করে।" (সূরা: আল-বাকারা, আয়াত নং ১৬৪)

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ـ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ـ وَاللّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ـ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ـ

অর্থাৎ, "তোমরা কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন আকাশগুলো এবং তাতে চন্দ্রকে রেখেছেন জ্যোতিষ্ক এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উৎপাদন করেছেন মাটি থেকে, তারপর তিনি তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন।" (সূরা: নূহ, আয়াত নং ১৫ থেকে ১৮)

কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ـ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ـ

"আফারায়াইতুম মা তুমনূনা ওয়া আনতুম তাখলুকুনাহু আম নাহনুল খালিকুন।"

অর্থাৎ, তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তাকে কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি? অবশেষে বলা হয়েছে–

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ ـ

অর্থাৎ, "আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।" (সূরা: আল-ওয়াকিয়া, আয়াত নং ৭৩)

বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি সামান্য সচেতন ব্যক্তিও এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আসমান ও জমিনে অবস্থিত বিস্ময়কর বস্তু সমূহের প্রতি লক্ষ করে এবং জীবজন্তু ও উদ্ভিদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ করে, তবে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, এই সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার একজন ব্যবস্থাপক রয়েছেন। তিনি কখনও কখনও এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন মানুষের মূল সৃষ্টিই তার সাক্ষ্যদাতা। মানুষ আল্লাহর কুদরতের অধীন। তাঁর কৌশল অনুযায়ী চেষ্টা ও সাধনা বিকাশ লাভ করতে থাকবে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ـ

অর্থাৎ, "আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ?" (সূরা: ইবরাহীম, আয়াত নং ১০)

এজন্যই মানুষকে তওহীদের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশ্যে তিনি পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষ বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। মানুষকে একথা বলার আদেশ দেয়া হয়নি যে, তাদের মাবুদ এক সত্তা আর বিশ্বের মাবুদ অপর এক সত্তা। কেননা, জন্মলগ্ন থেকেই এটা মানুষের মজ্জাগত ব্যাপার ছিল। তজ্জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ـ

অর্থাৎ, "তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।"

কুরআনে আরও বলেন–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ-

অর্থাৎ, "অতএব আপনি একাগ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত দীনের প্রতি মুখমণ্ডল স্থির রাখুন। এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাব ধর্ম, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্ট নিয়মের কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই হল সঠিক ধর্ম।" (সূরা: আর-রূম, আয়াত নং ৩০)

ফলকথা, আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বর্ণনায় মানুষের জন্মের বিষয়টি কুরআনে পাকে এত বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, আর কোনোরূপ প্রমাণ উল্লেখের প্রয়োজন হয় না, তবু বক্তব্য বেশি শক্তিশালী করার জন্য কালাম শাস্ত্রের একটি যুক্তিও এখানে উল্লেখ করছি। যে ব্যক্তি বা বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে না পারিভাষিক অর্থে তা হাদেস (অনিত্য) নামে পরিচিত। এরূপ অনিত্য ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্য অবশ্যই একটি কারণের প্রয়োজন। এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এ জগৎ-সংসার এরূপ অনিত্য কারণ। এখন আছে কিন্তু 'এক সময়' এর জন্য কোনো না কোনো কারণ অবশ্যই প্রয়োজন। এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সুতরাং, বিশ্বজগতের অস্তিত্ব লাভের পেছনেও অবশ্যই কোনো কারণ রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর কারণই হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই এ বিশ্ব-জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা নিত্য বিরাজমান, অনাদি-অনন্ত এবং চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের কোনো আদি নেই। বরং প্রত্যেক বস্তু মৃত হোক, জীবিত হোক, সবার আগে তিনিই ছিলেন ও আছেন। এর দলিল হল, তিনি কাদীম অর্থাৎ, নিত্যকার না হয়ে হাদেস হলে তিনিও অস্তিত্ব লাভের জন্য কোনো নিত্য কারণের মুখাপেক্ষী হতেন। সে কারণটিও অন্য কারণের মুখাপেক্ষী হত, আবার সেটাও অন্য কারণের মুখাপেক্ষী হত, এভাবে এ মুখাপেক্ষিতার কোনো শেষ থাকত না, যার ফলে মূল কারণটি পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ত। সুতরাং, কোনো না কোনো পর্যায়ে গিয়ে একটি মূল কারণ মেনে নিতেই হবে। আর ওই কারণটিই হল নিত্যকার, চিরন্তন এবং আদি। আমাদের লক্ষ্যই সে কারণটি এবং তাঁরই

নাম-পরিচয় জগৎস্রষ্টা, বিশ্বপালক, সৃষ্টিকর্তা বা সমস্ত কিছুর উদ্ভাবক প্রভৃতি।

তৃতীয় মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা যেমন অনাদি তেমন অন্তও বটে। তাঁর অস্তিত্বের কোনো শেষ বা সমাপ্তি অসম্ভব, কারণ তিনি বিলুপ্ত হলে হয়তো নিজে নিজেই বিলুপ্ত হবেন, না হয় কোনো বিলুপ্তকারীর দ্বারা বিলুপ্ত হবেন। বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব হলে কোনো বস্তুর নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভও সম্ভব হয়ে থাকে। তারপর কোনো বিলুপ্তকারীর দ্বারা বিলুপ্ত হওয়াও বাতিল। মূল বিষয়ের দ্বারা তাঁর স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, বিলুপ্তকারী হাদেস তথা অনিত্য হলে সে নিজেই চিরন্তনত্বের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে, এমতাবস্থায় সে চিরন্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারে না।

চতুর্থ মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা কোনো আয়তনে সীমাবদ্ধ নন, বরং তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। তার প্রমাণ হল, আয়তনে পরিবেষ্টিত বা সীমিত বস্তু হয় আয়তক্ষেত্রে অবস্থানশীল হবে অথবা সে ক্ষেত্র থেকে গতিশীল হবে। অবস্থান এবং গতিশীলতা উভয়ই হাদেস তথা অনিত্য, যা আল্লাহর জন্য নয়।

পঞ্চম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা কোনো বস্তু দ্বারা গঠিত শরীররূপী নন। কেননা, যা কিছু কোনো বস্তু দ্বারা গঠিত, তাকেই শরীরী বলে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু যখন কোনো বস্তু নন এবং কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থানকারীও নন, তখন তাঁর পক্ষে শরীরী হওয়াও অবান্তর। বিশ্ব স্রষ্টার শরীরী হওয়া আইনসম্মত হলে চন্দ্র, সূর্য অথবা অন্য কোনো শরীরী বস্তুকে আল্লাহরূপে বিশ্বাস করার অবকাশ থাকে।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ পাক কোনো শরীরী বস্তুর সাথে প্রতিষ্ঠিত কিংবা কোনো বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট কোনো গুণ বা বিষয় নয়। কেননা, প্রত্যেক শরীরী বস্তুই হাদেস বা অনিত্য। আর যে এসব শরীরী বস্তুকে অস্তিত্বের জগতে আনবে, তার এগুলো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকতে হবে; সুতরাং আল্লাহ তায়ালার পক্ষে কোনো শরীরী বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোনো গুণ হওয়া সম্ভব হতে পারে না। কেননা, তিনি অনাদি কালেই সবার পূর্বে একাই বিদ্যমান ছিলেন। তখন তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। নিজের

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরেই তিনি শরীরী বস্তু ও গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। উল্লিখিত ছয়টি বিষয় থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান, আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি কোনো পদার্থ নন, শরীরী বস্তু নন এবং কোনো গুণও নন। সমগ্র বিশ্বই পদার্থ, গুণ ও শরীরী বস্তু। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি অন্য কারও মত নন এবং কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছুও তাঁর মত নয়।

সপ্তম মূলনীতি হল: আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা কোনো দিকের বিশেষত্ব থেকে পবিত্র। কেননা, দিক হল মোট ছটি যথা: উর্ধ্ব, অধ, ডান, বাম, অগ্র ও পশ্চাৎ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এ দিকগুলোকে মানব সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি মানুষের দুটো দিক সৃষ্টি করেছেন একটি ভূমি সংলগ্ন, যা, পা বলে কথিত হয়। আর অপরটি তার বিপরীত, যা মাথা নামে পরিচিত। অতঃপর উর্ধ্ব শব্দটি উপরের দিকের জন্য এবং অধ শব্দ নিচের দিকের জন্য তৈরি হয়েছে। আল্লাহ মানুষের জন্য দুটো হাত তৈরি করেছেন। স্বাভাবিক নিয়মে এর একটি অপরটির চেয়ে শক্তিশালী। যেটি শক্তিশালী, সেটির নাম রাখা হয়েছে ডান এবং অপরটির নাম রাখা হয়েছে বাম।

অতঃপর যে দিকটি ডানে তার নাম ডান দিক এবং যে দিকটি বামে তার নাম বাম দিক রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য আরও দুটো দিক সৃষ্টি করেছেন এক দিক মানুষ চোখ দ্বারা দেখে ও সেদিকে চলে। এ দিকটির নাম রাখা হয়েছে সামনে এবং বিপরীত দিকটির নাম রাখা হয়েছে পিছন দিক। সুতরাং, বলা যায় যে, যদি উল্লিখিত ছয়টি দিক মানব সৃষ্টি না করতেন, তা হলে ওইসব দিকেরও সৃষ্টি হত না। সুতরাং, এ দিকগুলো হাদেস ও অনিত্য। যতদিন মানুষ থাকবে, এ দিকগুলোও ততদিন থাকবে। মানুষ বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এ দিকগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ তায়ালা এ দিকগুলোর দ্বারা অনাদিকালেও বিশেষিত হতে পারেন না এবং এখনও পারেন না। কেননা, মানব সৃষ্টিকালে তিনি কোনো বিশেষ দিকে ছিলেন না। আল্লাহর জন্য উর্ধ্ব দিক হতে পারে না। কারণ, তিনি মাথা থেকে মুক্ত। আর মাথার দিককেই বলা হয় উর্ধ্ব। একইভাবে আল্লাহর জন্য অধ দিকও হতে পারে না। কেননা, পা থেকেও তিনি মুক্ত। প্রশ্ন হতে পারে, দোয়া করার সময় মানুষ

উর্ধ্ব দিকে হাত তোলে কেন? এর জবাব হল দোয়া করার জন্য কিবলা হল আকাশের দিকে, এ ছাড়া এর মধ্যে অপর এক ইশারা রয়েছে যে, যার কাছে দোয়া বা প্রার্থনা করা হয়, তিনি খুবই প্রতাপশালী ও মহান। পক্ষান্তরে, উর্ধ্ব বা উচ্চতার দিকটি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের দাবিদার। আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেক বস্তুর উপরে রয়েছেন।

অষ্টম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা ওই অর্থে আরশে মুয়াল্লার উপর সমাসীন রয়েছেন যে অর্থ তাঁর নিজের থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর সমাসীন হওয়ার যে অর্থ তাঁর বিশালত্বকে খাটো করে না এবং যাতে অনিত্যতা বা ধ্বংসের কোনো অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সমাসীন হওয়ার এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। যথা:

ثم استوى الى السماء وهى دخان-

অর্থাৎ, "অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আকাশে আরোহণ করলেন। তখন আকাশ ছিল বাষ্পাকার।" এ অর্থ শুধু আল্লাহর প্রচণ্ডতা ও প্রাবল্য ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ, তিনি আকাশের উপর প্রবল হলেন। হকপন্থীদেরকে বাধ্য হয়ে এ অর্থ গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন বাতিলপন্থীরা মজবুর হয়ে এ আয়াতের ব্যাখ্যার স্বরূপ উল্লেখ করেছেন,

وهو معكم اينما كنتم-

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন সর্বসম্মতিক্রমে তিনি বেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সব জানেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীর সমর্থনকারী। যেমন: قلب المومن بين اصبعى الرحمن মুমিনের অন্তর আল্লাহর দুটো অঙ্গুলির মধ্যে। এখানে অঙ্গুলির অর্থ কুদরত এবং প্রাবল্য। হজরে আসওয়াদ আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত। এখানে এর অর্থ উক্ত পাথর দুনিয়াতে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ না করে প্রকাশ্য অর্থে রেখে দিলে তা অবান্তর হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে "ইসতাওয়া" শব্দের প্রকাশ্য অর্থ অবস্থান করা ও স্থান গ্রহণ করা নেয়া হলে আল্লাহ পাকের দেহবিশিষ্ট হওয়া এবং আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যার ফলে আল্লাহ হয় আরশের সমান কিংবা ছোট বা

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বড় হবেন। এর যে কোনোটি অসম্ভব ও অবান্তর। সুতরাং প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।

নবম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা আকার, পরিমাণ এবং দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতে তিনি মুমিনদের চর্মচোখে দৃষ্টিগোচর হবেন। কেননা, পবিত্র কুরআনে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -

অর্থাৎ, "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন প্রফুল্ল হবে। কেননা, তাঁরা তাঁকে দেখতে পাবেন।" (সূরা: আল-কিয়ামাহ, আয়াত নং ২২ ও ২৩)

জগতে তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ করেন–

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ -

অর্থাৎ, "চোখের দৃষ্টি তাঁকে ধরতে পারে না, তিনি দৃষ্টিকে ধরতে পারেন।" (সূরা: আল-আনআম, আয়াত নং ১০৩)

তদুপরি আল্লাহ তায়ালা হজরত মূসা (আ)-এর আকাঙ্ক্ষার জওয়াবে স্বয়ং এরশাদ করেছেন– لَن تَرَانِي অর্থাৎ, "তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পাবে না।" (সূরা: আল-আরাফ, আয়াত নং ১৪৩)

দশম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। মুহূর্তে নতুন নতুন সৃষ্টিতে ও আবিষ্কারে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো সমকক্ষ সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর সাথে কেউ ঝগড়া বিবাদ করতে পারে না। এর প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত, যেমন–

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا -

অর্থাৎ, "যদি আসমান-জমিনে আল্লাহ ছাড়া আরও কোনো উপাস্য থাকত, তবে আসমান জমিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, যদি আল্লাহ দু'জন হন এবং তাঁদের মধ্যে কোনো এক জন কোনো কাজ করতে চান, তবে অপর মাবুদ তার সাথে একমত হলে বা তার মতে সায় দিলে ওই খোদা অক্ষম ও অপারগ বলে গণ্য হবেন। সর্বশক্তিমান মাবুদরূপে গণ্য হবেন না। আর যদি দ্বিতীয় মাবুদ প্রথম মাবুদকে তার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন, তবে দ্বিতীয় মাবুদ সবল ও সক্ষম বলে বিবেচিত হবেন এবং প্রথম মাবুদ

অকেজো, দুর্বল ও অক্ষমরূপে ঘৃণ্য হবে। সর্বশক্তিমানরূপে প্রতিপন্ন হবেন না।

দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান এবং তাঁর উক্তিতে তিনি পরম সত্যবাদী। যেমন– 'ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' অর্থাৎ, তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাশীল। কেননা এ সৃষ্টিজগৎ কারিগরির দিক থেকে খুবই মজবুত এবং সৃষ্টিগতভাবেই সুদক্ষ পরিচালনার অধীন। সুতরাং, যদি কেউ সুন্দর বয়নকৃত, কারুকার্যমণ্ডিত ও সুসজ্জিত রেশমি বস্ত্র দেখে এমন ধারণা করে যে, এটা কোনো মৃত ব্যক্তি বয়ন করেছে, যার কিছু করার ক্ষমতা নেই। তা হলে অবশ্যই সে মূর্খ ও নির্বোধরূপে গণ্য হবে। তদ্রূপ, আল্লাহর সৃষ্টজগৎ দেখে তাঁর কুদরত অস্বীকার করা চরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালার নিজের জ্ঞান দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। আসমান ও জমিনে এমন কোনো একটি ক্ষুদ্র বিন্দু নেই যা তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তে নেই। তিনি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে খুবই সত্যবাদী। যথা:

وهو بكل شيئ عليم -

অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি আরও বলেছেন:

ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير -

অর্থাৎ, "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী-সর্বজ্ঞ।"

এতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করো। কেননা, সাধারণ বস্তুর মধ্যেও সৃষ্টিনৈপুণ্য ও শিল্পকর্মের সাজগোজ ও সুষ্ঠুতা দেখে নিঃসন্দেহে শিল্পীর ব্যবস্থাপনার জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা জীবন্ত। কারণ, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত সম্প্রসারিত, তাঁর জীবনও স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত। যাঁর কুদরত গতিশীল ও স্থিতিশীল, জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা-সংশয় দেখা দিতে পারে। এটা দিক-দিশা-ভ্রমেরই নামান্তর।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ মূল বিষয় হল: আল্লাহ স্বীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, যা কিছু বিদ্যমান, তা সব তাঁরই ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি যা করার ইচ্ছে করেন, তা-ই করেন। কারণ তাঁর তরফ থেকে কোনো একটি কাজ প্রকাশিত হলে তার বিপরীত কাজও প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কুদরত দুই প্রকার কাজের সাথেই একইরূপ সম্পর্কিত। সুতরাং, কুদরতকে উভয় প্রকার কাজের মধ্যে এক কাজমুখী করার জন্য ইচ্ছুক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পঞ্চম মূল বিষয় হল: আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন। অন্তরের কু-চিন্তা-ভাবনা ও ধারণার মত গোপন বিষয়ও তাঁর দৃষ্টির ভিতরে। কেননা, শ্রবণ ও দর্শন পূর্ণতা লাভ করলেও তিনি নিজে অপূর্ণতার গুণ নয়। সুতরাং, আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দর্শন স্বীকার না করলে তাঁর সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করলেও তিনি নিজে অপূর্ণ হবেন। তা ছাড়া হজরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সামনে তাঁর পেশকৃত প্রমাণও সহীহ হবে না। তাঁর পিতা ভুলের কারণে মূর্তিপূজা করত। তিনি পিতাকে বলেছিলেন: যথা কুরআনে রয়েছে–

لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا۔

অর্থাৎ, "আপনি এমন মূর্তির পূজা কেন করেন, যে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং আপনার কোনো উপকারে আসে না।"

তবে যদি ইবরাহীম (আ)ও তাঁর পিতার উপাস্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তবে তাঁর প্রমাণাদি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যতাও প্রমাণিত হবে না; যথা:

ذلك حجتنا اتيناها على ابراهيم على قومه۔

অর্থাৎ, "এটা আমার প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবেলায় দিয়েছি।"

যেমন আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া কর্মকর্তা হওয়া এবং অন্তর ও মস্তিষ্ক ছাড়াই জ্ঞানী হওয়া, চক্ষু ছাড়া দ্রষ্টা হওয়া এবং কর্ণ ছাড়া শ্রোতা হওয়া, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা কথা বলেন এবং তাঁর কথা বলা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি গুণ। এ কথায় স্বর নেই, শব্দও নেই। তাঁর এ কালাম বা কথা বলা অন্যের কথা বলার অনুরূপ নয়। যেমন তাঁর সত্তা অন্যের সত্তার মত নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর কালাম মনের বিষয়, শব্দ ও কণ্ঠস্বর তো শুধু তা প্রকাশ করার জন্য। যেমন: নড়াচড়া ও ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারাও তা কখনও কখনও প্রকাশ করা যায়। বুঝি না কোনো কোনো লোকের নিকট বিষয়টি কেন দুর্বোধ্য হল, অথচ অন্ধকার যুগের কবিদের কাছেও বিষয়টা দুর্বোধ্য ছিল না।

সপ্তম মূল বিষয় হল: যে কালাম আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, তা-ও অনাদি বা চিরন্তন। আল্লাহর সব গুণই এই প্রকারের। কেননা, আল্লাহর জন্য অনিত্য কোনো বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অসম্ভব; বরং ওগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা আল্লাহর শানের প্রতিকূল। কেননা, অনিত্যের যেকোনো কিছুই পরিবর্তনশীল। অথচ আল্লাহর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। কাজেই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কালামও অনাদি বা চিরন্তন।

অষ্টম মূল বিষয় হল: আল্লাহর ইলম চিরন্তন। অর্থাৎ, তাঁর গুণ, সত্তা ও সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ঘটে, সমস্ত বিষয় তিনি সর্বদাই জানেন। যখনই কোনো জীব জন্মে, তার সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান তখনই নতুন করে লাভ হয় না বরং ওই জ্ঞান তাঁর অনাদিকাল থেকেই রয়েছে।

নবম মূল বিষয় হল: আল্লাহর ইচ্ছা, অনাদি বা চিরন্তন। বিশেষ ও যথাযথ সময়ে সৃষ্টিকর্মের সাথে অনাদি কালেই এ ইচ্ছা সম্পর্কিত আছে। কেননা, তাঁর ইচ্ছা অনিত্য হলে তিনি অনিত্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়বেন, যা তাঁর শানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

দশম মূল বিষয় হল: আল্লাহ তাঁর নিজ জ্ঞানে জ্ঞানী, নিজ জীবনে জীবিত, নিজ শক্তিতে শক্তিমান, নিজ ইচ্ছাতে ইচ্ছুক, নিজ কালামে (কালামকারী) নিজ শ্রবণ শক্তিতে শ্রোতা, নিজ দৃষ্টিশক্তিতে দ্রষ্টা। এগুলো তাঁর চিরন্তন গুণ।

তৃতীয় স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল: দুনিয়ার যত ঘটনা ও কাজ-কারবার ঘটে, সবই আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর কার্য এবং আল্লাহরই

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবিষ্কার। তিনিই এ বিশ্ব সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আর কেউ এ বিশ্ব সৃষ্টি করেনি। বান্দার সব কাজ-কর্মই আল্লাহর কুদরতের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ মূল বিষয়টির সমর্থন রয়েছে। যথা:

الله خالق كل شيئ-

অর্থাৎ, "সবকিছুর স্রষ্টাই আল্লাহ তায়ালা।"

অন্য আয়াতে রয়েছে; যথা:

الله خلقكم وما تعلمون-

অর্থাৎ, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং যা তোমরা করে থাকো, তাকে।"

অন্য আয়াতে রয়েছে– "তোমরা গোপনে কথা বলো বা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের ভেদ জানেন। আর যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেনই না-বা কেন? তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।"

দ্বিতীয় মূল বিষয় হল: আল্লাহ বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা, তাই বলে তাতে একথা জরুরি হয়ে যায় না যে, বান্দার কাজ-কর্ম ইকতিসাব অর্থাৎ, উপার্জন হিসেবে বান্দার আওতাধীন থাকবে না; বরং আল্লাহ ক্ষমতা ও ক্ষমতাশালী দুটোকেই সৃষ্টি করেছেন। কুদরত অর্থাৎ, ক্ষমতা আল্লাহপ্রদত্ত বান্দার একটি গুণ। সেটা বান্দার নিজের উপার্জিত নয়। কাজ-কর্মও আল্লাহর সৃষ্ট আর বান্দার গুণও উপার্জিত। মোটকথা কাজ-কর্ম বান্দার একটি কুদরত গুণের অধীনে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, কাজ-কর্ম সৃষ্টির দিক থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের অধীনে এবং ইকতিসাব অর্থাৎ, উপার্জনের দিক থেকে অধীনে। কাজেই বান্দার কাজ-কর্মগুলো একেবারেই যে বাধ্যতামূলক তা বলা মুশকিল।

তৃতীয় মূল বিষয় হল: বান্দার কাজ-কর্ম তার উপার্জিত হলেও আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, দুনিয়ায় ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, লাভ-ক্ষতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা কুফর ও ঈমান, পথভ্রষ্টতা, হেদায়েত, ফারমাবরদারি, নাফরমানি প্রভৃতি যা কিছু হয়ে থাকে, সবই আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক হয়। কেউ তাঁর ফয়সালা বদলাতে পারে না এবং তাঁর আদেশ প্রতিরোধে সক্ষম হয় না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে

ইচ্ছা পথ দেখিয়ে দেন, আল্লাহ নিজ কাজের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করেন না। তবে বান্দাকে অবশ্য জবাবদিহি করতে হবে। এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হল সমগ্র উম্মত এ বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাসী যেমন– কালামে পাকে রয়েছে–

ان لو يشاء لهدى الناس جميعا-

অর্থাৎ, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব মানুষকেই সৎপথ দেখাতেন।"

আরও এরশাদ হয়েছে–

لو شئنا لاتينا كل نفس هداها-

অর্থাৎ, "আমি ইচ্ছা করলে সবাইকেই সুপথ দান করতাম।"

একথার যুক্তি ও জ্ঞানগত প্রমাণ হল, যদি আল্লাহ গুনাহ ও অন্যায়কে খারাপ জেনে এগুলোর ইচ্ছা না করেন, তবে এগুলো তাঁর শত্রু ইবলিসের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষের মধ্যে গুনাহ ও নাফরমানিরই আধিক্য। তা হলে দেখা যাচ্ছে ইবলিস আল্লাহর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী বেশি কাজ করে। আল্লাহর ইচ্ছায় কাজ খুব কমই হয়। কারণ, মুমিন-মুসলমান আল্লাহর মর্যাদাকে এমন স্তরে কিভাবে নামিয়ে দেবে যে, স্তরে গ্রামের কোনো সর্দার ব্যক্তিকে নামিয়ে দিলে সে-ও সর্দারিকে ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং সর্দারির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাবে। যেমন– গ্রামে যদি ওই সর্দারের কোনো শত্রু থাকে আর লোকজন বেশি কাজ-কর্মই যদি সেই শত্রুর ইচ্ছানুযায়ী করে আর সর্দারের ইচ্ছা মানুষের কাছে কমই রক্ষিত হয়, তবে ওই সর্দার ব্যক্তি এমন সর্দারিকে অবমাননাকর না ভেবে পারবে? বেদয়াতিগণের মতে, মানুষের নাফরমানি আল্লাহর ইচ্ছার খেলাফে হয়ে থাকে এটা আল্লাহর দুর্বলতা ও অক্ষমতার দলিল স্বরূপ (আল্লাহ পানাহ দিন); সুতরাং, যখন প্রমাণিত হল যে, কাজ-কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট, তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বান্দার কাজ-কর্ম আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, আল্লাহ যে কাজের ইচ্ছা করেন তা করতে বান্দাকে নিষেধ করা হয় কিভাবে এবং যে কাজের ইচ্ছা তিনি করেন না, সে কাজের আদেশ করা হয় কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল, আদেশ ও ইচ্ছা দুটো ভিন্ন বিষয়। আদেশ করলেই তার সাথে ইচ্ছাও রয়েছে তা বলা যাবে না।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ মূল বিষয় হলঃ সৃষ্টি, আদেশ, আবিষ্কার এসবই আল্লাহর দয়া মাত্র। তাঁর প্রতি আবশ্যক কিছুই নয়, তবে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মত হল, এগুলো আল্লাহর প্রতি আবশ্যক। কারণ, এর মধ্যে বান্দার উপকার রয়েছে। তাদের এ মতটি ভ্রান্ত। কেননা, ওয়াজিবকারী তিনি নিজেই। অতএব তিনি কিভাবে ওয়াজিব হওয়ার লক্ষ্যস্থল হতে পারেন? ওয়াজিব হল, এমন কাজ যা ছেড়ে দিলে তখন অথবা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য বান্দার প্রতি ওয়াজিব, এর অর্থ হয় এই আনুগত্য ত্যাগে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিংবা এভাবে বুঝুন যে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পক্ষে পানি পান করা জরুরি বা ওয়াজিব। অর্থাৎ, এটা ত্যাগ করলে বা পানি পান না করলে পরে তার অসুস্থতা বাড়বে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই অর্থে কোনো কিছুই আল্লাহর উপর আবশ্যক হতে পারে না।

পঞ্চম মূল বিষয় হলঃ যে কাজ করার ক্ষমতা বান্দার মধ্যে নেই। সে কাজের আদেশ করা আল্লাহর জন্য জায়েজ। যদিও তিনি স্বভাবত এরূপ আদেশ করেন না। কেননা, যদি এটা জায়েজ না হয়, তা হলে তা না করার দোয়া করা অর্থহীন হয়ে পড়ে, অথচ আল্লাহ তায়ালার নিজ উক্তিতে এরূপ প্রার্থনা প্রমাণিত রয়েছে। যথা:

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ-

অর্থাৎ, "হে রব, আমাদের উপর এমন দায়িত্ব চাপাবেন না, যা আমাদের সাধ্যের বাইরে।" (সূরা: আল-বাকারা, আয়াত নং ২৮৬)

ষষ্ঠ মূল বিষয় হলঃ আল্লাহ কোনো পূর্বকৃত অপরাধ অথবা ভবিষ্যতের সওয়াব ছাড়াই বান্দাকে শাস্তি দিতে সক্ষম, এটা আল্লাহর জন্য বৈধ। কেননা, তিনি তাঁর ক্ষমতা নিজ মালিকানায় প্রয়োগ করে থাকেন, অন্যের মালিকানায় নয়। অন্যের মালিকানায় তাঁর অনুমতি ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগ করা অত্যাচারের নামান্তর। এরূপ করা আল্লাহর জন্য অসম্ভব। আল্লাহর সামনে অন্যের কোনো মালিকানা নেই যে, তাতে ক্ষমতা প্রয়োগে আল্লাহর অত্যাচার হতে পারে। আমরা জীব-জানোয়ার জবেহ হতে দেখি। মানুষ আমাদের খুবই কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে থাকে, অথচ তাদের পূর্বকৃত কোনো অপরাধ নেই। সুতরাং, একথা বলা যে, আল্লাহ তায়ালা রোজ কিয়ামতে

জীব-জানোয়ারকে জীবিত করে মানুষের কাছ থেকে তাদের কষ্ট-ক্লেশের বদলা দেবেন; তবে, তা শরীয়ত ও বিবেক উভয় বহির্ভূত হবে।

সপ্তম মূল বিষয় হলঃ আল্লাহ বান্দার সাথে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করেন। বান্দার জন্য যা অধিক উপযুক্ত ও বাহ্যত বেশি ভাল মনে হয়, তা তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, আমি আগেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহর উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হওয়া জ্ঞানের বোধগম্যের বাইরে। তিনি যা করেন তার জন্য তাঁর কোনো জবাবদিহির দরকার নেই, কিন্তু মানব-জীনজাতিকে স্বীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি অবশ্য করতে হবে।

অষ্টম মূল বিষয় হলঃ আল্লাহ পাকের মারেফাত ও ইবাদত তাঁর ওয়াজিব করার দিক দিয়ে এবং শরয়ী আইনের দিক দিয়ে ওয়াজিব।

নবম মূল বিষয় হলঃ পয়গাম্বরগণ প্রেরণ করা অবান্তর ও অবাস্তব নয়। বারাহেমা সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করে বলে, যেখানে বিবেক-বুদ্ধি উপস্থিত, সেখানে পয়গাম্বরদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। এ কথার জবাব হল, পারলৌকিক মুক্তির কারণ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মানা যায় না। যেমন এ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষার ওষুধ-পত্রের কথা জানা যায় না। তা জানে কেবল চিকিৎসকগণ। সুতরাং, চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই পয়গাম্বরগণের প্রয়োজন আছে। তবে তফাৎ কেবল এতটুকু যে, চিকিৎসকের কথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়। আর পয়গাম্বরগণ মুজিজার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হন।

দশম মূল বিষয় হলঃ আল্লাহ তায়ালা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীন রূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে প্রকাশ্য মুজিজার দ্বারা সমর্থন করেছেন। যেমন, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা, পাথরের তাসবীহ পাঠ করা, চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা, অঙ্গুলি থেকে পানির স্রোত বয়ে চলা ইত্যাদি। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রকাশ্য মুজিজার দ্বারা আরবগণকে হেদায়াত করেছেন এবং তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছেন, তা হল কুরআন মজীদ। আরবরা ভাষাসৌন্দর্য, ছন্দলালিত্য ও অলঙ্কারাদি নিয়ে খুবই গর্ব করত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুরআন মাজীদের মুকাবেলা করতে পারেনি। কারণ, কুরআন পাকের রচনাশৈলী, চন্দলালিত্য, ভাবগাম্ভীর্য এবং বাক্যাবলির

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাধুর্য ও বিশুদ্ধতার অনুরূপ সবকিছুর সমাবেশ দ্বারা রচনা তৈরি করা যেকোনো মানুষের সাধ্যের বাইরে।

আরবরা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্যাতন করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা করেছে, দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে; কিন্তু তারা কুরআনের অনুরূপ রচনা তৈরি করতে পারেনি। অথচ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী লোকদের নির্ভুল খবর এবং বিভিন্ন অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদাদি উপস্থাপন করেছেন, যার সত্যতা স্পষ্ট দিবালোকের মত প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত দুটোতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যথা:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ-

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্য তোমরা নিরাপদে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডিবে এবং কেউ কেউ চুল কাটবে।" (সূরা: ফাতহ)

غُلِبَتِ الرُّومُ - فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ-

অর্থাৎ, "রোম পরাজয় বরণ করেছে নিকটবর্তী ভূ-ভাগে; তারা এ পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে।" (সূরা: আর-রূম, আয়াত নং ২ ও ৩)

মুজিজা রাসূলের সত্যতার প্রমাণ। কেননা, মানুষ যে কাজে অক্ষম, তা আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ নয়। এই শ্রেণির কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতা ঘোষিত হওয়া।

চতুর্থ স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল: পুনরুত্থান ও কিয়ামত যা শরীয়ত বর্ণনা করেছে, তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। বিবেকের বিচারে এর অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। এর অর্থ হচ্ছে, মরার পরে পুনর্জীবন লাভ, এটি আল্লাহর সুনির্দিষ্ট ব্যাপার। তিনি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তিনি পুনর্জীবিত করবেন। তিনি বলেন–

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ-

অর্থাৎ, "কাফের বলল, অস্থিগুলো পচে-গলে যাওয়ার পর এগুলোকে কে জীবিত করবে? বলে দিন, যিনি এগুলোকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন।" (সূরা: ইয়াসীন, আয়াত নং ৭৮)

আয়াতে প্রথমবার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার সৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

ما خلقكم وما بعثكم الا كنفس واحدة-

অর্থাৎ, "তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনর্জীবন দান এ প্রাণের সৃষ্টি ও পুনর্জীবন দানের মতই সম্ভবপর।"

দ্বিতীয় মূল বিষয় হল: মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন করাকে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এটা বিবেকের বিচারে অসম্ভব নয়। কেননা, এতে আবশ্যক হয়ে যায় যে, জীবন আবার এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যে অবস্থায় তাকে সম্বোধন করা যায়। এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না যে, মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল ও স্থির থাকে এবং মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন সে শুনতে পায় না, এ আপত্তি অমূলক। কেননা, ঘুমন্ত ব্যক্তিও বাহ্যত অচল ও স্থির থাকে। (স্বপ্নের মাধ্যমে) অভ্যন্তরে (অন্তরে) এমন কষ্ট ও স্বাদ অনুভব করে, জাগ্রত হওয়ার পরেও তাঁর প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেশতা জিবরাইলের কথাবার্তা শুনতেন এবং তাঁকে দেখতেন, কিন্তু তাঁর নিকটবর্তী লোকগণ তা শুনত না ও দেখত না বা কিছুই জানতে পারত না।

তৃতীয় মূল বিষয় হল: কবর-আজাব অবশ্যই হবে তা, শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا و يوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون اشد العذاب-

অর্থাৎ, "তাদের সকালে ও সন্ধ্যায় দোজখে পেশ করা হবে, যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (বলা হবে) ফিরাউনের বংশধরকে কঠোরতম আজাবে প্রবেশ করাও।"

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা কবর-আজাব থেকে (আল্লাহর দরবারে) আশ্রয় কামনা করতেন।

কবর-আজাব সম্ভব ও বাস্তব। একে সত্য জানা ওয়াজিব। মৃতদেহের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ হিংস্র জন্তুর পেটে ও পাখিদের চঞ্চুতে বিভক্ত হয়ে গেলেও কবর-আজাবের সত্যতায় সংশয়ের অবকাশ নেই। কেননা, শাস্তির যন্ত্রণা প্রাণীর বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। তা ছাড়া প্রাণীর দেহের ওইসব বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়া, আল্লাহর কুদরতের বাইরে নয়।

চতুর্থ মূল বিষয় হল: হাশরের ময়দানে দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হওয়া সত্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

ونضع موازين القسط ليوم القيامة۔

অর্থাৎ, "আমি রোজ কিয়ামতে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব।"

তারপর আছে–

فمن ثقلت موازينه فالئك هم المفلحون من خفت موازينه فالئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون۔

অর্থাৎ, "অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে, আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারা হবে নিজেদের প্রতি ক্ষতিসাধনকারী। তারা চিরকাল দোজখে থাকবে।"

আল্লাহ তায়ালার কাছে আমল যত বেশি ভাল হবে, তার ওজনও তত বেশি হবে। এর দ্বারা বান্দা তার আমলের পরিমাণ জেনে যাবে এবং সে পরিষ্কার বুঝবে যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলে তা তার ন্যায়বিচার হবে আর সওয়াব দিলে তা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ স্বরূপই হবে।

পঞ্চম মূল বিষয় হল: পুলসিরাত সত্য। যা দোজখের উপর স্থাপিত হবে, তা চুল অপেক্ষা চিকন এবং তরবারি অপেক্ষ ধারালো। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون۔

অর্থাৎ, "অতঃপর তাদের দোজখের (পুলের দিকে) পুলে নিয়ে যাও এবং তাদের দাঁড় করিয়ে দাও, নিশ্চয় তাদের প্রশ্ন করা হবে।" এ পুল সম্ভব বা বাস্তব, তাই একে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। যে আল্লাহ পাখিদের শূন্যে উড়াতে পারেন, তিনি মানুষকে এ পুলের উপর দিয়েও চালাতে পারবেন।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔

অর্থাৎ, "তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের মাগফিরাত এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন জুড়ে। এটা খোদাভীরুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।" (সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত নং ১৩৩)

নির্মাণ বা প্রস্তুত করা হয়েছে শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বেহেশত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একে এই শাব্দিক অর্থে রাখাই ওয়াজিব। " বিচার দিনের পূর্বে বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একে এই শাব্দিক অর্থে রাখাই ওয়াজিব। "বিচার দিনের পূর্বে বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টি করার ভেতরে কী সার্থকতা ও উপকারিতা আছে? কেউ এমন প্রশ্ন তুললে জবাবে বলবেন, আল্লাহ তায়ালা যা কিছুই করেন, তজ্জন্য তাঁকে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। তবে বান্দার কৃতকর্মের জন্য বান্দাকেই জবাবদিহি করতে হয়।

সপ্তম মূল বিষয় হল: হজরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে ইমাম অর্থাৎ, সত্যপন্থী শাসক হলেন প্রথম হজরত আবু বকর (রা), দ্বিতীয় হজরত ওমর (রা), তৃতীয় হজরত ওসমান (রা), চতুর্থ হজরত আলী (রা)। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের পরে কে ইমাম হবেন, তা সুস্পষ্টভাবে বলেননি। বললে অবশ্যই তা প্রকাশ পেত। কারণ, বিভিন্ন শহরে যাদের তিনি শাসক নিযুক্ত করেছিলেন বা বিভিন্ন অভিযানে যাদের তিনি সেনানায়ক নিযুক্ত করেছেলেন, তাদের নাম প্রকাশ করে দেয়া হত। ইমামের বিষয়টি এর তুলনায় আরও বেশি প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। তবে, এটা গোপন থাকল কেমন করে? আর যদি প্রকাশ পেয়েই থাকত, তা হলে তা মিটে গেলই– বা কেমন করে? তা সবার নিকট পৌঁছল না কেন? ফলকথা হল, হজরত

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবু বকর (রা) জনসাধারণের পছন্দের মাধ্যমে এবং বাইয়াতের পদ্ধতিতে খলিফা হয়েছেন। যদি কেউ বলে যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ ছিল অন্যের জন্য, তা হলে সব সাহাবীর প্রতি দোষারোপ করতে হয় যে, তাঁরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশের খেলাফ করেছেন। কেবল রাফেজী (শিয়া) সম্প্রদায় ছাড়া এমন ধৃষ্টতা কেউ দেখায়নি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা এবং অভিমত হল, সব সাহাবীকেই ভাল বলা চাই। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যেমন তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তদ্রূপ তাঁদের প্রশংসা করতে হবে। হজরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার মুয়ামালা সবই ছিল ইজতিহাদ ভিত্তিক। হজরত ওসমান (রা)-এর ঘাতকদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারের চেষ্টা করা এবং তাদের হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর হাতে অর্পণ করার ফল খেলাফতের জন্য তখনকার পরিস্থিতিতে মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে; বরং তাদের একটু দেরিতে গ্রেফতার করা যুক্তিযুক্ত হবে। কেননা, তাদের দল ও জনসংখ্যাগত শক্তি অনেক বেশি। এমনকি তাদের লোক সেনাবাহিনীতেও মিশে রয়েছে। তাই তিনি তাদের গ্রেফতারের ব্যাপারটা দেরি করা যৌক্তিক এবং প্রয়োজন মনে করেছিলেন। পক্ষান্তরে, হজরত মুয়াবিয়া (রা) মনে করেছিলেন যে, এমন মারাত্মক অন্যায় ঘটনা সত্ত্বেও ঘাতকদের শাস্তির ব্যাপারে দেরি করার ফলে তারা এভাবে খলিফাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। তাই প্রকারান্তরে এটা হত্যাকাণ্ডের সমর্থনের শামিল। বিজ্ঞ ওলামাদের মতে, প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পন্থী।

অষ্টম মূল বিষয় হল: সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়ে থাকে তাঁদের খেলাফতের ক্রমানুযায়ী। কেননা, আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠত্বই হল প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব। তবে আল্লাহর দরবারের শ্রেষ্ঠত্ব কোনটি, তা শুধু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম বিষয় এবং ক্রমাদি তাঁরাই জানেন, যাঁরা নুজুলে কুরআন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের এ ক্রম না বুঝলে, খেলাফতের প্রতিষ্ঠা এভাবে করতেন না। কেননা, তাঁরা আল্লাহর কাজে কোনো সমালোচকের সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। অর্থাৎ, কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাদের সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারত না।

www.AmarIslam.com

নবম মূল বিষয় হল: মুসলমান বালেগ, জ্ঞানী এবং স্বাধীন ব্যক্তির খলিফা হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে। যথা: পুরুষ হওয়া, পরহেজগার হওয়া, আলিম হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া, কুরাইশ বংশধর হওয়া। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ রয়েছে যে, الائمة من قريش অর্থাৎ, "ইমাম তথা খলিফা কুরাইশদের থেকে হয়।" তবে উল্লিখিত পঞ্চগুণ বিশিষ্ট একাধিক লোক বিদ্যমানে অধিক সংখ্যক লোক সমর্থিত ব্যক্তি খলিফা হবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহের শামিল।

দশম মূল বিষয় হল: পরহেজগার ও আলিম না হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি খেলাফতের আসনে আসীন থাকে, তাকে পদচ্যুত করায় যদি জনসাধারণের মধ্যে বিপুল ফেতনা-ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে আমার মতে তার খেলাফত অবৈধ নয়। কারণ, তাকে পদচ্যুত করার ফলে হয়তো অন্য কেউ খলিফা হবে কিংবা খেলাফতের পদ খালি থাকবে। অন্য কেউ খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত হলে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানদের যে দুর্যোগ দেখা দেবে তা বর্তমান খলিফার মধ্যে কোনো কোনো শর্তের অনুপস্থিতির ক্ষতির তুলনায় বেশি মারাত্মক হবে।

বলাবাহুল্য যে, উল্লিখিত শর্তগুলো বেশি উপযোগিতা পাবার কারণেই নিরূপিত হয়েছে। এখন অধিক উপযোগিতা অর্জিত না হওয়ার শঙ্কায় মূল উপযোগিতা নষ্ট করে দেয়া জ্ঞানীদের কাজ নয়। অপর পক্ষে খেলাফতের পদ খালি থাকলে শাসনব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে পড়বে। সুতরাং, এক্ষেত্রে পূর্বাবস্থা বহাল থাকাই যুক্তিযুক্ত। ফলকথা, উল্লিখিত বারোটি স্তম্ভে বর্ণিত মোট চল্লিশটি মূল বিষয়ই হল আকায়েদের নামান্তর। যে এগুলো বিশ্বাস করবে, সে আহলে সুন্নতের অনুসারী হবে এবং বিদয়াতপন্থীদের থেকে পৃথক থাকবে। আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি স্বীয় তওফিক এনায়েত করে আমাদের সত্যের উপর বহাল রাখুন এবং স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহগুণে আমাদের সুপথে পরিচালিত করুন।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য:

১. ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রধানত তিন প্রকার মত লক্ষ করা যায়। কারও কারও মতে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি এক ও অভিন্ন;

২. কেউ কেউ বলেন, দুটোই আলাদা আলাদা, পরস্পরে মিল নেই এবং

৩. কারও কারও মতে, এ দুটো বিষয়ই আলাদা। কিন্তু একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। এবার আমি তিন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে যা পরিষ্কার সত্য, তা উল্লেখ করছি।

প্রথম প্রকার আলোচনা করার বিষয় দুটোর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে। সত্য কথা হল, আভিধানিক অর্থে ঈমান হল সত্যায়ন করা অর্থাৎ, সত্য বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও প্রকাশ করা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وما انت بمومن لنا۔

অর্থাৎ, "তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।"

মুমিন অর্থ সত্যায়নকারী বা মনে-প্রাণে বিশ্বাসকারী।

ইসলামের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা। সত্যায়ন বা বিশ্বাস এক বিশেষ স্থান তথা হৃদয় দ্বারা হয়ে থাকে। মুখ হল তার প্রকাশক। আর স্বীকার করা হৃদয় দিয়ে হয়। এভাবে মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য পালন করা। মূলকথা এই যে, অভিধানের দিক থেকে ইসলাম একটি ব্যাপক বিষয়। আর ঈমান হল একটি বিশেষ বিষয়। মূলত ইসলামের শ্রেষ্ঠ অংশের নাম ঈমান। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সব সত্যায়ন বা বিশ্বাসকে মেনে নেয়া বলা চলে। কিন্তু প্রত্যেক মেনে নেয়াকে সত্যায়ন বা বিশ্বাস বলা চলে না। এবার দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা করব, শরয়ী পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের অর্থ সম্পর্কে। সত্য কথা হল, শরীয়তে দুটোরই ব্যবহার তিনভাবে হয়ে থাকে। যেমন– উভয়কে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়, উভয়কে পৃথক পৃথক অর্থে

ব্যবহার করা হয় এবং একটির অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং একটির অর্থে অপরটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমোক্ত ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহর বাণীর প্রতি লক্ষ করুন। যথা: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔

অর্থাৎ, "সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদের উদ্ধার করলাম কিন্তু সেখানে মাত্র একজন মুসলমানের গৃহ পাওয়া গেল।" (সূরা: আয-যারিয়াত, আয়াত নং ৩৫ ও ৩৬)

এ ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, গৃহ একটিই ছিল এবং একারণেই মুমিনীন এবং মুসলিমীন শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়েছে। আরও ইরশাদ হয়েছে–

يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين۔

অর্থাৎ, "হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁর উপরই নির্ভর করো; যদি তোমরা মুসলমান হও।"

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে এ পাঁচটি স্তম্ভই উল্লেখ করেন। তা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন বিষয়।

আর এ দুটো আলাদা আলাদা হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা। যথা:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا۔

অর্থাৎ, "গ্রাম্যরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি (অর্থাৎ, বিশ্বাস করেছি) আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি বরং বলো, ইসলাম গ্রহণ করেছি।" (সূরা: হুজুরাত, আয়াত নং ১৪)

আমরা প্রকাশ্য আনুগত্য স্বীকার করেছি। এখানে বুঝা যাচ্ছে, ঈমান অর্থ-শুধু অন্তরের সত্যায়ন বা বিশ্বাস আর ইসলাম অর্থ মৌখিক সত্যায়ন। জিবরাইলের হাদীসে আছে, যখন জিবরাইল রাসূলে পাকের নিকট জিজ্ঞেস

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন, ঈমান কী জিনিস? তিনি জবাব দিলেন, বিশ্বাস করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর হিসাব-নিকাশের প্রতি, আর এ বিষয়টির প্রতি যে, ভাল ও মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন হল ইসলাম কী জিনিস? জবাবে তিনি এ পাঁচটি বিষয়ই উল্লেখ করে বললেন। উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কথায় ও কাজে স্বীকার করাকে বলে ইসলাম। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, হজরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন এবং অন্য ব্যক্তিকে দিলেন না, অথচ যে মুমিন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন, সে মুমিন নয়, মুসলিমই। কিন্তু হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস পুনরায় বললেন, সে মুমিন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও বললেন, "না, সে মুসলিম"।

ঈমান ও ইসলাম একটি অন্যটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণ হল, একবার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেউ প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, ইসলাম। আবার প্রশ্ন করা হল, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, ঈমান। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, দুটোই ভিন্ন ভিন্ন। আবার একটি অপরটির শামিলও বটে। অভিধানের দিক দিয়ে এটিই হল সর্বোত্তম। কেননা, ঈমান হল আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। আর ইসলাম হল মেনে নেয়ার নাম। চাই তা অন্তর দ্বারা হোক, মুখে হোক কিংবা চাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হোক। তবে এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল, অন্তর দ্বারা মেনে নেয়া। অন্তরের এ মেনে নেয়াকেই তাসদীক তথা আন্তরিক বিশ্বাস বলা হয়। আর ঈমান হল এটাই।

এবার তৃতীয় প্রকার আলোচনা করব শরীয়তগত বিধান সম্পর্কে। ঈমান ও ইসলামের শরীয়তসূচক বিধান হল দুটো। একটি হল ইহলৌকিক এবং দ্বিতীয়টি হল পারলৌকিক। পারলৌকিক বিধান হল, দোজখের আগুন থেকে বের করা এবং তাতে চিরকাল থাকার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। যেমন– হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان-

অর্থাৎ, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে দোজখ থেকে বের করা হবে।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

অবশ্য মতভেদ রয়েছে যে, দোজখ থেকে বের হয়ে আসা কোন ঈমানের ফল? কারও মতে, মোটামুটিভাবে বিশ্বাসেই এ ফল পাওয়া যাবে। কেউ কেউ বলেন যে, এ ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে তার স্বীকার করা। আবার কারো কারো মতে এর সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকেও যোগ করা চাই। ফলকথা হল, যার মধ্যে এ তিনটি গুণ বা অবস্থা রয়েছে, তার সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তার ঠিকানা নিশ্চিতই বেহেশতে হবে। আর যার মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ দুটো পাওয়া যাবে এবং কম-বেশি আমলও তার সাথে থাকবে, দু' একটি কবীরা গুনাহও সে করবে, তার সম্পর্কে মুতাজিলা সম্প্রদায় এ মত পোষণ করে যে, সে ঈমান বহির্ভূত, তবে কুফরের মধ্যেও শামিল নয়। এ লোক ফাসেক, সে দোজখে চিরকাল থাকবে।

আমাদের মতে, মুতাজিলা সম্প্রদায়ের এ মত বাতিল, যার মধ্যে– تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ "তাসদিক বিল জিনান" অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাস থাকবে, কিন্তু اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ "ইকরার বিল লিসান" মৌখিক স্বীকৃতি এবং اَلْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ "আমাল বিল-আরকান" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই যদি সে

মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নিজের নিকট এবং আল্লাহর নিকট ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করল। অতএব এ ব্যক্তি দোজখ থেকে বের হয়ে আসবে। কেননা, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায় :---

অসিলা তথা সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ

পবিত্র কুরআন থেকে অসিলা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

অর্থাৎ, "এসব লোক নিজেদের আত্মাসমূহের উপর জুলুম করে (হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আপনার দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আপনিও তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে নিঃসন্দেহে এরা আল্লাহ তায়ালাকে তওবা কবুলকারী, মেহেরবান পাবে।" (সূরা: আন-নিসা- ৬৪)

এ আয়াতে কারীমা দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক গুনাহগারের জন্য সব সময় কিয়ামত অবধি মাগফেরাত (ক্ষমা)-এর অসিলা। ظَلَمُوْا (অর্থাৎ যারা অত্যাচার করেছে) এর মধ্যে কোনো শর্তারোপ (قيد) নেই বরং সাধারণ অনুমতি আছে।

অর্থাৎ সর্বপ্রকার গুনাহগার আপনার দরবারে উপস্থিত হোক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং প্রভুর প্রতি অসিলা তালাশ করো এবং তার পথে জেহাদ করো; যেন তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা: মায়েদা- ৩৫)

এ আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা যায় যে, আমলসমূহ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের অসিলা তালাশ করা অপরিহার্য। কারণ (আয়াতে লক্ষণীয় যে) আমলসমূহের কথাতে اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর) তা-ই বুঝা গেল যে, এ অসিলা হল আমলসমূহের অতিরিক্ত।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

استغاثة (ইস্তিগাসা)-এর আভিধানিক অর্থ

আরবি ভাষায় সাহায্য চাওয়াকে استغاثة বলে।

কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতেও استغاثة শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নিকট সাহাবায়ে কিরামের প্রার্থনার বর্ণনা সূরায়ে আনফালে এসেছে–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ

"যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট (সাহায্য চেয়ে) প্রার্থনা করছিলে।" (সূরা: আল-আনফাল: ৯)

অভিধান শাস্ত্রবিদদের মতে استغاثة ও استعانة উভয় শব্দ সাহায্য চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগিব ইসপাহানী (র) استغاثة শব্দের অর্থ করেন–

اَلْاِسْتِغَاثَةُ طَلَبُ الْعَوْنِ

استغاثة "শব্দের অর্থ সাহায্য চাওয়া।" (আল মুফরাদাত: ৫৯৮)

استعانة শব্দটিও কুরআন মাজীদে সাহায্য-প্রার্থনা অর্থে এসেছে। সূরা ফাতিহায় বান্দাকে দুআর নিয়ম শিক্ষা দিতে এসেছে–

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"তোমারই কাছে সাহায্য চাই।" (সূরা ফাতিহা: ৪)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

অর্থাৎ, "হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলমানের সম্পদরাজির সদকা গ্রহণ করুন আর তা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন, আর এদের জন্য মঙ্গল কামনা করুন; কারণ আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের অন্তরের প্রশান্তি।" (সূরা: আত-তাওবা– ১০৩)

বুঝা গেল যে, সদকা খায়রাত, সৎকর্মসমূহ পবিত্রতর যথেষ্ট অসিলা অথবা মাধ্যম নয়; বরং পবিত্রতা তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগ্রহের মাধ্যমে লাভ হয়।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থাৎ মহান প্রভু সেই শক্তিমান, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদেরই মধ্যে থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন; যিনি তাদের কাছে প্রভুর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত (আবৃত্তি) করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হেকমত বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। (সূরা: জুমা– ২)

বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক পবিত্র করেন। তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মাধ্যম।

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

অর্থাৎ এ কিতাবীগণ (ইহুদী ও খ্রিস্টান) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভাগমনের আগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলা দিয়ে বিজয়লাভের মুনাজাত করত। (সূরা: আল-বাকারা– ৮৯)

কাজেই বুঝা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভাগমনের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর নামের অসিলায় যুদ্ধসমূহে বিজয় লাভের মুনাজাত করত এবং কুরআনে কারীম তাদের এ কর্মের উপর আপত্তি করেনি বরং সমর্থন করেছে এবং বলেছে যে, তাঁর নামের অসিলায় তোমরা মুনাজাত করতে। এখন তাঁর প্রতি ঈমান আনছ না কেন?

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র নাম আবহমান কাল থেকে সবসময় অসিলা হিসেবে ব্যবহৃত।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে কতেক 'কলেমা' (প্রার্থনাবাক্য) পেয়েছেন, যেগুলোর অসিলা দিয়ে দোয়া করেছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর 'তওবা' কবুল করেছেন। (সূরা: আল-বাকারা– ৩৭)

অনেক সম্মানিত তাফসীরকার বলেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'নামের' অসিলায় মুনাজাত করেছেন, যা কবুল হয়েছে। বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মানিত নবীগণ আলাইহিস সালাম-এরও অসিলা।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা আসমানের দিকে ফিরাতে বারংবার দেখেছি। আচ্ছা, আমি আপনাকে ঐ কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যার প্রতি আপনি সন্তুষ্টি আছেন। (সূরা: আল-বাকারা- ১৪৪)

বুঝা গেল যে, 'কিবলা পরিবর্তন' কেবল এজন্য হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এটা ইচ্ছা ছিল। কাবা মুয়াজ্জামা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় 'কিবলা' হয়েছে। যখন কাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় মুখাপেক্ষী তখন আমাদের ও তোমাদের ন্যায় নগণ্যের কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا

অর্থাৎ হযরত খিজির আলাইহিস সালাম দেয়ালের কথা উল্লেখ করে মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন এই দেয়ালের নিচে দুটি এতিম শিশুর ধনাগার আছে। তদের পিতা সৎ ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য আপনার প্রভু চান যে, এদের ধনাগার রক্ষিত থাকুক এবং এরা যুবক হয়ে তাদের ধন বের করে নেবে। (সূরা: কাহফ- ৮২)

জানা গেল যে, এতিম শিশুদের উপর পরম দয়াময়ের এ অনুগ্রহ হয়েছে যে এদের ভগ্ন দেয়াল সংস্কারের জন্য দুজন মকবুল বান্দা প্রেরিত হয়েছেন। তার কারণ এ ছিল যে, এদের পিতা পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পুণ্যবান পিতার অসিলায় আওলাদের উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ হয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

অর্থাৎ, ওরা যাদের ডাকে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের রবের নিকট অসিলা তালাশ করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। (সূরা: বনি ইসরাঈল- ৫৭)

বুঝা গেল যে, কাফেরগণ নেকবান্দাদের উপাসনা করছিল। নেক বান্দাগণ তাঁদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক নৈকট্য ব্যক্তির অসিলা

তালাশ করছেন। আল্লাহ পাক এ অসিলা তালাশের উপর আপত্তি করেন নি।

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থাৎ যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান স্ত্রীলোক না হত, যাদেরকে তোমরা জান না! (যদি এ বিষয়ের আশঙ্কা না হত) যে, তোমরা তাদেরকে নিষ্পেষণ করে ফেলতে। এরপর তোমাদের উপর ধ্বংস এসে পড়ত তাদের অজ্ঞাতসারে। (বিজয় তো হয়ে যেত) কিন্তু, এতে বিলম্ব এ জন্য হয়েছে যেন আল্লাহ যাকে চান আপন রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। যদি ঐ মুসলমান কাফেরদের থেকে আলাদা হয়ে যেত তবে আমি কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব দিতাম।

(সূরা: ফাতহ- ২৫)

বুঝা গেল যে, মক্কার কাফেরগণ আযাব থেকে নিরাপদে থাকার কারণ এ যে, তাদের অঞ্চলে কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিল। শহরে আল্লাহর সৎ ব্যক্তির অস্তিত্ব, বেদ্বীনদের নিরাপত্তার অসিলা হয়ে থাকে।

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ـ

অর্থাৎ বিজয়ী ব্যক্তিরা বলল যে, আমরা "আসহাবে কাহফ"-এর উপর (পাশে) মসজিদ নির্মাণ করব। (সূরা: কাহাফ)

জানা গেল যে, বুজুর্গদের কবরসমূহের কাছে মসজিদ নির্মাণ করা উত্তম, যাতে তাঁদের অসিলায় নামাযের মধ্যে বরকত হয়, এবং অধিক কবুল হয়। কুরআনে কারীম আসহাবে কাহাফের গুহার উপর মসজিদ তৈরির (ঘটনা) কথা বর্ণনা করেছে এবং তা খণ্ডন করেনি। যদ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের এ কাজ আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয়েছে।

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ـ

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন ভাইদের বললেন যে, আমার জামা নিয়ে যাও আর আমার সম্মানিত পিতার চেহারার উপর রাখো, তার চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে যাবে। (সূরা: ইউসুফ- ৯৩)

জানা যায় যে, বুজুর্গদের পোশাকের অসিলায় দুঃখ দূর হয়ে যায় ও শেফা লাভ হয়।

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ -

অর্থাৎ আমি কসম করছি এ মক্কা নগরীর। হে মাহবুব আলাইহিস সালাম, এতে আপনি তাশরীফ রেখেছেন। (সূরা: আল-বালাদ)

জানা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় মক্কা মুকাররমার এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এর নামে কসম করেছেন।

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ - وَطُورِ سِينِينَ - وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

অর্থাৎ আঞ্জির (ফলবিশেষ) 'যইতুন' ও 'তুর' এর এবং এ নিরাপত্তাসম্পন্ন শহরের শপথ। জানা গেল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর অসিলায় তুর পর্বতের সম্মান লাভ হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় মক্কা শরীরে এমন বরকত লাভ হয়েছে যে, এর শপথ মহান প্রভু করেছেন। এতে আরও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, অসিলার দ্বারা প্রাণহীন বস্তুগুলোও উপকৃত হয়। (উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের বিস্তারিত বর্ণনা কানযুল ইরফান ও মুখতারুত তাফাসীরে (বাংলা) দেখুন।)

إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

অর্থাৎ, হযরত শামভীল আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে বললেন যে, তালুত-এর রাজত্বের প্রমাণ এ যে, তার নিকট "তাবুতে সকীনা" (প্রশান্তির সিন্দুক) আসবে যার মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালাম এর "তাবারকসমূহ" রয়েছে। এটাকে ফেরেশতাগণ আলাইহিস সালাম বহন করবেন। (সূরা: বাকারা- ২৪৮)

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে এমন সিন্দুক দিয়েছিলেন যার মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ পাদুকা মুবারক, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম-এর পাগড়ি মুবারক আর অন্যান্য তবারুকসমূহ ছিল যেটা বনী ইসরাঈলগণ যুদ্ধের অভিযানে সামনে রাখত; যার বরকতে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করত।

জানা গেল যে, বুজুর্গদের তবারুকসমূহের অসিলায় বিপদাপদ দূর হয়, সমস্যাবলির সমাধান হয়।

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন যে, আমি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি। তারপর তন্মধ্যে ফুৎকার দিই, যদ্বারা সেটা প্রতিপালকের হুকুমে পাখি হয়ে যায়। (সূরা: আলে-ইমরান- ৪৯)

জানা গেল যে, বুজুর্গদের ফুঁকের অসিলায় মাটির মধ্যে প্রাণ এসে যায় আর রোগাক্রান্তগণ শেফা লাভ করে।

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي -

অর্থাৎ সামেরী বলল যে, আমি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর ঘোটকীর পদাঙ্ক থেকে এক মুষ্টি (মাটি) নিলাম আর স্বর্ণের বাছুরের মুখে রাখলাম, তখন বাছুর আওয়াজ দিতে আরম্ভ করল। (সূরা: তো-হা- ৯৬)

জানা গেল যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর ঘোটকীর পায়ের নিচের মাটির অসিলায় সোনার প্রাণহীন বাছুরের মাঝে প্রাণ সঞ্চার হলো।

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ -

অর্থাৎ বলে দিন তোমাদেরকে মালাকুল মউত বেসাল (মৃত্যু) দেবে; যাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে। (সূরা: সাজদা- ১১)

জানা গেল যে, হযরত মালাকুল মউত আলাইহিস সালাম-এর অসিলায় প্রাণ বের হয়।

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا -

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামকে বললেন যে, আমি তোমাদের প্রভুর দূত হই। এ কারণে এসেছি যে, তোমাকে পবিত্র পুত্র দান করব। (সূরা: মরিয়ম- ১৯)

জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর অসিলায় পুত্র অর্জিত হয়েছে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না এ অবস্থায় যে আপনি (হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে থাকছেন। অর্থাৎ মক্কাবাসী আজাব থেকে এ কারণে বেঁচে আছে যে, আপনি তাদের মাঝে সসম্মানে উপস্থিত আছেন। (সূরা আনফাল- ৩৩)

জানা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা হল আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তার অসিলা।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا

অর্থাৎ, আর যখন তোমরা (বনী ইসরাঈলরা) বলেছ, হে মূসা, আমরা এক ধরনের খাবার (মান্না-সালওয়া)-এর উপর কখনও সবর করব না। স্বীয় প্রভুর কাছে দোয়া করুন, যেন তোমাদের জন্য ভূমির ফসল উৎপাদন করেন। (সূরা: বাকারা- ৬১)

জানা গেল যে, বনী ইসরাঈলগণ যখন কোনো কথা প্রভুর নিকট আরজ করতে ইচ্ছা করত, তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর অসিলায় করত।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ -

অর্থাৎ হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামকে অমৌসুমি ফল খেতে দেখার পর হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম মরিয়ম আলাইহিস সালাম এর কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন। (সূরা: আলে ইমরান- ৩৮)

জানা গেল যে, বুজুর্গদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করা অধিক কবুল হওয়ার কারণ বা মাধ্যম।

استغاثة বা সাহায্য প্রার্থনা দু'ভাবে হয়ে থাকে

১. استغاثة بالعول-মৌখিক সাহায্য চাওয়া।

২. استغاثة بالعمل-কাজের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া।

বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি যদি মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে কারো নিকট সাহায্য চায় তবে তা হবে استغاثة بالعول।

আর যদি সাহায্যপ্রার্থী তার অবস্থা ও কাজের মাধ্যমে সাহায্য চায়, তবে তাকে استغاثة بالعمل বলা হয়।

استغاثة بالقول-মৌখিক সাহায্য চাওয়া

কুরআন মাজীদে হজরত মূসা (আ)-এর ঘটনায় استغاثة بالقول-এর দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

"আর আমি ওহী প্রেরণ করেছি মূসার প্রতি- যখন তার নিকট তার সম্প্রদায় পানি প্রার্থনা করেছে, এ পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করো।" (সূরা: আল-আরাফ: ১৬০)

ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম। সাইয়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীর ধর্ম তাওহীদ তথা একত্ববাদের বিশ্বাস হল সকল নবীর শরীয়তেরই মূল ভিত্তি এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অপর নবীর শরীয়তের শিক্ষার আলোকে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন হাকিকি সাহায্যকারী নেই। তথাপি উক্ত আয়াতে মুবারাকায় সাইয়্যিদুনা মূসা (আ)-এর নিকট পানি চেয়ে استغاثة করা হয়েছে। যদি এ কাজটি শিরক হতো, তাহলে এ শিরক-মিশ্রিত আবেদনের ভিত্তিতে মুজিযা দেখানো হতো না। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখনই কোনো নবীর কাছে তাওহীদের বিপরীত কোনো আবেদন পেশ করা হয়েছে তৎক্ষণাৎ তাঁরা শিরকের সকল পথ রুদ্ধ করার প্রয়াসে তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনার জবাবে স্বয়ং সাইয়্যিদুনা মূসা (আ)-কে মুজিযা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

এর উদ্দেশ্যে হলো– আল্লাহ পাক এটাই স্পষ্ট করে দিলেন যে, আসল সম্পাদনকারী তো নিঃসন্দেহে আমিই কিন্তু হে মূসা (আ), মুজিযা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।

استغاثة بالعمل-কর্মের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া

বিপদ সম্পর্কে মৌখিক কোনো শব্দ ব্যবহার না করে কোনো বিশেষ কাজ কিংবা অবস্থার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়াকে استغاثة بالعمل বলা হয়। কুরআন মাজীদে কর্মের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া বৈধতার সপক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় ও সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালামের ঘটনা বর্ণিত আছে।

হজরত ইউসুফ (আ)-এর বিচ্ছেদে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করার দরুন তাঁর সম্মানিত পিতা হজরত ইয়াকুব (আ) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) এটা জানতে পেরে নিজের একটি জামা ভাইদের মাধ্যমে তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট ইস্তিগাসার জন্য পাঠালেন এবং বললেন, এটা আমার সম্মানিত পিতার চোখে লাগাবেন। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর বাস্তবেও এমনই হয়েছিল। এ ঘটনা আল্লাহ পাক কালামে মাজীদে নিম্নোক্ত শব্দাবলির দ্বারা বর্ণনা করেছেন–

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا

"আমার এই জামা নিয়ে যাও। এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দিবে। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।" (সূরা ইউসুফ: ১৩)

হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহোদরেরা যখন জামাটি নিয়ে সাইয়্যিদুনা ইয়াকুব (আ)-এর চোখে বুলিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে–

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا

"অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা উপস্থিত হলো তখন সে জামাটা ইয়াকুবের চেহারার উপর রাখল, তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল।" (সূরা: ইউসুফ: ৯৬)

আল্লাহ পাকের মনোনীত নবী হজরত ইয়াকুব (আ)-এর বরকতময় আমল যা দ্বারা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে তা ব্যবহারিকভাবে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামা দ্বারা ইস্তিগাসা। এটা হল, استغاثة بالعمل-এর সর্বোৎকৃষ্ট কুরআনী উদাহারণ। যাতে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আ)-এর জামা আল্লাহ তায়ালার দরবারে দৃষ্টিশক্তি পাওয়ার অসিলা হয়েছে।

استغاثة ও توسل-এর মধ্যকার সম্পর্ক

استغاثة ও توسل উভয়ের মধ্যে বাস্তবে একই বিষয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য কেবল فعل-এর দিক থেকেই। যখন ঐ فعل তথা কাজের সম্পর্ক সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি করা হয় তখন ব্যক্তির এ আমলকে استغاثة বলা হয়। আর মুস্তাগাসে মাজাযী (আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে অন্যকে সাহায্য করার উপযুক্ত মনে করে যার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়) হলেন অসিলা। কেননা, প্রকৃত সাহায্যকারী হলেন, আল্লাহ তায়ালা। কাজেই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আমল হলো, استغاثة। আর জামাটি হলো অসিলা।

আর যদি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তাহলে যেহেতু আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারের চেয়ে বড় কোনো দরবার নেই এজন্য আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রকার অসিলা ব্যতীত প্রকৃত মুস্তাগাস হবেন।

উপর্যুক্ত কুরআনী বর্ণনায় استغاثة بالعمل আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত।

পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে অসিলা

(১) মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাঝে হযরত সুরাইহ ইবনে ওবাইদ (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে হযরত আলী মুরতাজা (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ জন "আবদাল" সম্পর্কে বলেন–

يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ الْعَذَابُ۔

অর্থাৎ, এ চল্লিশজন আবদালের অসিলায় বৃষ্টি হবে, শত্রুদের উপর বিজয় অর্জন করা যাবে এবং সিরিয়াবাসীদের থেকে আযাব দূরীভূত হয়ে যাবে। (মিশকাত শরীফ, ইয়ামেন ও শামের আলোচনা অধ্যায়)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা প্রিয় বান্দাদের অসিলায় বৃষ্টি, বিজয়, সাহায্য অর্জন এবং বিপদ দূরীভূত হয়।

(২) দারেমী শরীফে বর্ণিত এসেছে যে, একবার মদীনা শরীফে অনাবৃষ্টি হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা)-এর কাছে (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলে তিনি বললেন–

اُنْظُرُوْا اِلٰى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوْا فَمُطِرُوْا مَطَرًا حَتّٰى يَكُوْنَ نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتّٰى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ ـ

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযার ছাদ খুলে দাও, যেন নূরানী কবর ও আসমানের মধ্যে ছাদ বাধা হয়ে না থাকে। অতঃপর লোকেরা তেমনই করল। তখন মুহূর্তের মধ্যে এমন প্রবল বৃষ্টি হলো, উদ্ভিদ জন্মাল যার দরুন উট এমন হৃষ্টপুষ্ট হলো যেন চর্বিতে ভরে গেল।

জানা গেল যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের কবরের অসিলায় বারিধারা আসে।

(৩) "শরহে সুন্নাহ" এর মধ্যে আবি মুনকাদির (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোলাম হযরত সফিনা (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর আমলে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি কয়েদ থেকে পালাচ্ছেন। হঠাৎ একটা বাঘ সামনে এসে গেল। তিনি বাঘকে বললেন–

يَا اَبَا الْحَارِثِ ! اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ اَمْرِيْ كَيْتَ فَاَقْبَلَ الْاَسَدُ لَهٗ بَصْبَصَةً حَتّٰى اَقَامَ اِلٰى جَنْبِهٖ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهْوٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِيْ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدَ ـ

হে বাঘ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোলাম হই। আমার ঘটনা এরকম। এটা শুনে বাঘ লেজ নাড়তে নাড়তে হযরত সফিনা (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর কাছে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল। যখন

কোনো আওয়াজ শুনত তখন তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিকে গিয়ে পালাত এবং আবার হযরত সফিনা (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে যেত। মোট কথা বাঘটা সাধ্যমত তার হেফাজত ও খেদমতে আত্মনিয়োগ করল এ পর্যন্ত যে, তিনি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। এরপর বাঘটা ফিরে গেল।

জানা গেল যে, হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় বাঘও অনুগত হয়ে যায় আর হুজুরের গোলামদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়।

(৪) মুসলিম ও বুখারী-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র মেরাজের রাত্রে পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরজ হয়েছিল।

فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَ اُمِرْتَ بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ ـ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আমি ফিরবার সময় যখন মূসা আলাইহিস সালাম এর পার্শ্ব অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী আদেশ লাভ করেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন– হুজুর, আপনার উম্মতের মধ্যে এতটুকু ক্ষমতা নেই। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি। আপনার উম্মতের মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই। আপনার উম্মতের জন্য প্রভুর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন। (যেন পঞ্চাশ থেকে কমিয়ে দেন) (মিশকাত শরীফ, মেরাজের অধ্যায়)

অতঃপর বারবার অনুরূপ আরজ করায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই অবশিষ্ট রইল। (অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন।)

জানা গেল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর অসিলায় এ অনুগ্রহ ও কৃপা অর্জিত হয়েছে যে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে কেবল পাঁচ (ওয়াক্ত) অবশিষ্ট রইল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের অসিলা তাঁদের ওফাতের পরও কল্যাণকর হয়ে থাকে।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন জুমার দিন খুৎবার মাঝে এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আরজ করলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অবস্থায় দোয়ার জন্য হাত মুবারক উত্তোলন করলেন–

فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ ـ

আল্লাহর কসম, এখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দোয়ার পবিত্র হস্ত নামেনি, এদিকে পাহাড়ের মত মেঘ উঠল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনও মিম্বর শরীফ থেকে অবতরণ করেননি, এ দিকে বৃষ্টির পানি তাঁর দাড়ি মুবারক দিয়ে টপকে পড়ছিল।

সাত দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন পরবর্তী জুমায় অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হলে–

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ ـ

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন করলেন এবং আরয করলেন হে মওলা, এখন আমাদের উপর বর্ষণ বন্ধ হোক। এরপর মেঘকে যেদিকে ইশারা করতেন সেদিকে কেটে যেত। (মিশকাত শরীফ, মুজেযা অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম বিপদসমূহের কালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলা অবলম্বন করতেন।

(৬) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا انَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ ـ

আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ দিতে থাকেন (মিশকাত শরীফ ইল্‌মের অধ্যায়) বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ হুজুর পুর-নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণ্টন করে দেন বণ্টনকারী অসিলা হয়ে

থাকেন। কাজেই, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্রষ্টার প্রত্যেক নেয়ামতের অসিলা।

(৭) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মায়ায (ইবনে মালেক) (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দ্বারা একটি বড় পাপ সংঘটিত হয়ে গেল। তখন তিনি রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طَهِّرْنِىْ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পবিত্র করুন। (মিশ্‌কাত শরীফ শাস্তির অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) প্রভুর অবাধ্যতা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করতেন যে, আমাদেরকে পবিত্র করুন। কারণ, তাঁরা হুজুর আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাজাতের অসিলা জ্ঞান করতেন।

(৮) মুসলিম শরীফ "বাবুস সুজুদ" (সেজদার অধ্যায়)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রবীয়া ইবনে কা'ব (রাদি আল্লাহু আনহু) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন–

اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ ـ

ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার দরবারে মুনাজাত করছি যেন বেহেশতে আপনার সাথে থাকি।

বুঝা গেল যে, সম্মানিত সাহাবাগণ (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিপালকের সর্বপ্রকার নেয়ামত এমনকি বেহেশত অর্জনের অসিলা মনে করে হুজুর পুর-নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে মুনাজাত করতেন।

(৯) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত কবসা (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর ঘরে তার মশকে (চামড়ার তৈরি পানির থলে) মুখ মুবারক লাগিয়ে পানি পান করলেন।

فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَقَطَعْتُهٗ ـ

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি ঐ মশকের মুখ কেটে নিলাম। (মিশকাত-বাবুল আশ্‌রাব) এর ব্যাখ্যায় "মিরকাত শরহে মিশকাত" এর মধ্যে হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন–

اَیْ فَمَ الْقِرْبَةِ فَحَفَظْتُهُ فِیْ بَیْتِیْ وَاتَّخَذْتُهُ شِفَاءً ـ

অর্থাৎ মশকের মুখ কেটে নিয়ে ঘরে হেফাজত করে রেখেছি। যাতে এর দ্বারা আরোগ্য অর্জন করা যায়।

বুঝা গেল যে, সাহাবীরা এ মশকের মুখ দ্বারা রোগাক্রান্তদের শেফা লাভ করতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে স্পর্শ হবার বরকতে এ চামড়াকে আরোগ্য অর্জনের অসিলা মনে করতেন।

(১০) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসমা (রাদি আল্লাহু আনহা)-এর নিকট, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুব্বা শরীফ ছিল এবং তিনি বলতেন–

هٰذَا جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى نَسْتَشْفِیْ بِهَا ـ

এ জুব্বা শরীফ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা)-এর কাছে ছিল। তাঁর ওফাতের পর আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এ জুব্বা শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরতেন। আর এখন আমরা এ কাজ করি যে, মদীনা শরীফে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাকে এটা ধুয়ে পান করাই। এতে শেফা লাভ করে। বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর মোবারকের সাথে সম্পর্কিত জুব্বা শরীফকে আরোগ্যের অসিলা মনে করে এটা ধুয়ে পান করতেন।

(১১) নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদীদের একটি দল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হলো এবং আরজ করল যে, আমাদের নগরীতে ইবাদতখানা হচ্ছে "বি আ" (ইহুদীদের উপাসনাগার)। আমরা ইচ্ছা করছি যে, এটা ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করব–

فَاسْتَرْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاءَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ اَرْصَبَّهُ لَنَا فِیْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اِخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضِحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا ـ

আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে তাঁর "গাসালা মুবারক" (ব্যবহারকৃত পানি)-এর জন্য আবেদন করলাম। তখন তিনি পানি আনায়ে অযু করলেন এবং কুল্লি করলেন। আর কুল্লি ও অযুর এ পানিটুকু একখানা পাত্রে ঢেলে আমাদেরকে দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, যাও, আপন ভূমিতে এ পানি ছিটে দাও এবং ঐখানে মসজিদ নির্মাণ করো। (মিশকাত শরীফ-মসজিদের অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যবহৃত পানি হল অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা দূর করার মাধ্যম।

(১২) "ইবনুল বার কিতাবুল ইস্তিশাব-ফি মারিফাতীল আসহাবে" লিখেছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) বেসালের সময় ওসিয়ত করেছেন "আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাপড় দান করেছিলেন। আমি এ দিনের (অর্থাৎ মৃত্যুর দিন) জন্য রেখে দিয়েছি। এ কাপড়খানা যেন আমার কাফনের নিচে রাখা হয়।"

وَخُذْ ذٰلِكَ الشَّعْرَ وَالْاَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِیْ فَمِیْ وَعَلٰى عَيْنَیْ وَمَوَاضِعِ السُّجُوْدِ مِنِّیْ ـ

"এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ চুল মুবারক ও নখ মুবারক নাও। আর এগুলো আমার মুখে, চক্ষুদ্বয়ে ও সেজদার স্থানে রেখে দিবে।"

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম তবারুকসমূহকে কবরে শান্তির মাধ্যম মনে করে নিজেদের কবরসমূহে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। (আল্-হারফুল হাসান)

(১৩) মুহাদ্দিস আবু নঈম (রহমাতুল্লাহে আলাইহি) "তাবাকাতুস সাহাবাতে" ও মুহাদ্দিস দায়লমী (রহমাতুল্লাহে আলাইহি) "মসনদুল ফেরদাউসে" রেওয়ায়েত করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাম সাইয়্যেদুনা হযরত আলী মুর্তজা (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর সম্মানিতা মাতা হযরত ফাতেমা বিন্‌তে আসাদকে স্বীয় জামা দিয়ে কাফন দিয়েছেন এবং বেশ কিছুক্ষণ তাঁর কবরে শুয়ে আরাম করেছেন। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اِنِّیْ اَلْبَسْتُهَا لِتُلْبَسَ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِ وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِیْ قَبْرِهَا لِاُخَفِّفَ عَنْهَا عَنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ ـ

আমি আমার চাচী সাহেবাকে তার জামা এজন্য পরিয়েছি, যাতে তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করানো হয় এবং তাঁর কবরে এজন্য আরাম করেছি যেন তিনি কবরের সংকোচন থেকে নিরাপত্তা পান।

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত মুবারকের বরকতকে রোগাক্রান্তদের আরোগ্য লাভের উপায় মনে করতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাদেরকে নিষেধ করতেন না। বরং স্বীয় হাত মুবারক পানিতে ডুবিয়ে দিতেন।

(১৪) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَادَ خِدَمُ الْمَدِیْنَةِ بِاٰنِیَتِهِمْ فِیْهَا الْمَاءُ یَاتُوْنَ بِاِنَاءٍ اِلَّا غَمَسَ یَدَهُ فِیْهَا ـ

অর্থাৎ, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আদায় করতেন তখন মদীনা শরীফের শিশুরা পাত্রসমূহ নিয়ে আসতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকের পাত্রে হাত মুবারক ডুবাতেন।

বুঝা গেল যে, মদীনাবাসীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত মুবারকের বরকতকে রোগাক্রান্তদের শেফা লাভের অসিলা মনে করতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদেরকে নিষেধ করতেন না। বরং তার হাত মুবারক পানিতে ডুবিয়ে দিতেন।

(১৫) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

یَاْتِیْ عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ فَیَغْزُوْا فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَیَقُوْلُوْنَ هَلْ فِیْکُمْ مَنْ صَاحِبِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَیُفْتَحُ لَهُمْ ـ

মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, তারা যুদ্ধ করবে। তারা জিজ্ঞাসিত হবে– তোমাদের মধ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোনো সাহাবী আছে? জবাব দেয়া হবে হ্যাঁ। ঐ সাহাবীর অসিলায় বিজয় লাভ হবে।

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের অসিলায় জিহাদে বিজয় লাভ হয় এবং তাঁদের অসিলা গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। এ হাদীসে তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের অসিলার কথাও এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ ওলীগণের অসিলায় বিজয় ও সাহায্য অর্জিত হয়।

(১৬) বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِکُمْ ـ

অর্থাৎ তোমাদের বিজয় অর্জন হতো না এবং জীবিকা অর্জিত হতো না তবে অসহায় ঈমানদারদের বরকতে ও অসিলায়। (মিশকাত শরীফ বাবু ফাজলীল ফোকরা)

বুঝা গেল যে, গরীব অসহায়দের অসিলায় বৃষ্টি হয়, জীবিকা লাভ হয়, বিজয় ও সাহায্য লাভ হয়।

(১৭) তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফ প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِیْ ـ

অর্থাৎ আমার সুপারিশ এবং শাফায়াত আমার উম্মতের গুনাহে কবীরাকারীদের জন্য। (মিশকাত-বাবুল শাফায়াত)-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহমাতুল্লাহে আলাইহি) "লোময়াত শরহে মিশকাত" এর মধ্যে মতামত দিয়েছেন–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَیْ لِوَضْعِ السَّیِّئَاتِ وَاَمَّا الشَّفَاعَةُ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فَلِکُلِّ مِنَ الْاَتْقِیَاءِ وَالْاَوْلِیَاءِ ـ

অর্থাৎ পাপীদের জন্য মাফ করে দেয়ার সুপারিশ করা হবে। তবে মরতবা ও মর্যাদা উচ্চ করার শাফায়াত তো প্রত্যেক পরহেজগার ও ওলীর জন্য আছে।

বুঝা গেল সকল স্তরের ঈমানদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলার মুখাপেক্ষী। অসংখ্য অসৎ মানুষও হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ দ্বারা জান্নাতী হয়ে যাবে এবং কোনো ওলীও হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখাপেক্ষী হীন নয়। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর মুহতাজ)

(১৮) ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

یَشْفَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلٰثَةٌ ـ اَلْاَنْبِیَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ـ

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তিন প্রকার শাফায়াত করবে– (১) আম্বিয়া কেরাম (২) ওলামায়ে কেরাম ও (৩) শহীদগণ। (মিশকাত শরীফ, বাবুশ শাফায়াত)

প্রিয় পাঠকগণ বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম ও শহীদগণ সকল মুসলমানের জন্য নাজাতের অসিলা।

(১৯) তিরমিযী শরীফ, দারমী শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِیْ اَکْثَرَ مِنْ بَنِیْ تَمِیْمٍ ـ

অর্থাৎ আমার জনৈক উম্মতের সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের মানুষ থেকে বেশি সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে। (মিশকাত শরীফ-শাফায়াতের অধ্যায়)

এর ব্যাখ্যায় "মিরকাত শরহে মিশ্‌কাত" এ বিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

قِیْلَ الرَّجُلُ عُثْمَانُ ابْنُ غَفَّانَ قِیْلَ اُوَیْسُ قَرْنِیْ وَقِیْلَ غَیْرُهُ ـ

অর্থাৎ অনেক আলেম বলেন– ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত ওসমান গনি (রাদি আল্লাহু আনহু) আর কেউ কেউ বলেন– ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত

ওয়াইস ক্বরনী (রাদি আল্লাহু আনহু) আর অনেকে বলেন অন্য কোনো বুজুর্গ হবেন।

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতও নাজাতের মাধ্যম।

(২০) "শরহে সুন্নাহ" নামক হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন একটি উট যা ক্ষেতে চরছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলে তাঁর হাঁটু মুবারকের উপর মুখ রেখে ফরিয়াদ করল। সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মালিককে ডেকে বললেন–

اِنَّهُ شَکٰی کَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَاَحْسِنُوْا اِلَیْهِ ـ

এ উটটি অভিযোগ করছে যে, তুমি এর দ্বারা বেশি কাজ নিয়ে থাকো এবং খাদ্যে কম দিয়ে থাকো। তার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (মিশকাত শরীফ: মোজেজার অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, বুদ্ধিহীন জীবও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাজত মেটানোর অসিলা মনে করে। তাই, যে মানুষ হয়ে "অসিলাকে" অস্বীকার করে, সে উটের চেয়েও অধিকতর বিবেকহীন হয় কি?

(২১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় আবু লাহাবের শাস্তির কিছু হ্রাস হয়েছে। কেননা তার বাঁদি সোয়াইবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিল। (বুখারী শরীফ : কিতাবুল রিদা)

বুঝা গেল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যম এমন নেয়ামত, যার উপকার আবু লাহাবের ন্যায় কট্টর কাফির মরদুদও কিছু পেয়েছে। মুসলমান তো হল তাঁর একান্ত অনুগত।

(২২) বুখারী শরীফে মসজিদ অধ্যায়ে বর্ণিত এসেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হজ্বে যাবার পথে ঐ সকল স্থানে নামায আদায় করতেন, যে সব স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্বের সময় নামায আদায় করেছিলেন। বুখারী শরীফে এসব স্থানেরও উল্লেখ রয়েছে। বুঝা গেল, যে স্থানে বুজুর্গ ব্যক্তি ইবাদত করেন ওই স্থানটি কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) মাধ্যম হয়ে যায়।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুআ

دعا (দুআ) শব্দটি دعو থেকে এসেছে, যার অর্থ আহ্বান করা বা চিৎকার করে ডাকা। دعا (দুআ) শব্দটি কুরআন শরীফে পাঁচটি অর্থে এসেছে। যথা– (১) ডাকা, (২) আহ্বান করা, (৩) প্রার্থনা করা বা দুআ করা, (৪) পূজা করা তথা মাবুদ মনে করে ডাকা, (৫) আশা-আকাঙ্ক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান–

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ـ

ওদেরকে তাদের বাপের সূত্র ধরে আহ্বান করো। এটিই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। (সূরা: আল-আহযাব– ৫)

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ـ

রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পিছন থেকে ডাকতেন। (সূরা: আলে-ইমরান– ১৫৩)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ـ

রাসূলের ডাকাকে একে অপরকে ডাকার ন্যায় গণ্য করো না। (সূরা: আন-নূর– ৬৩)

এসব আয়াতে دعا (দুআ) অর্থ চিৎকার করে ডাকা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

আপনার প্রভুর রাহে লোকদেরকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন। (সূরা: আন-নাহাল– ১২৫)

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ

আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডেকো। (সূরা: আল-বাকারা– ২৩)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ـ

তোমাদের মধ্যে একদল এ রকম হওয়া উচিত, যারা ভালোর দিকে আহ্বান করে। (সূরা: আলে-ইমরান– ১০৪)

এ প্রকারের আয়াতে دعا (দুআ) অর্থ আহ্বান করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ـ

তোমাদের প্রভুর নিকট বিনয়ের সঙ্গে গোপনীয়ভাবে দুআ প্রার্থনা করো। (সূরা: আল-আরাফ– ৫৫)

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ـ

নিশ্চয় আমার প্রভু দুআ শ্রবণকারী। (সূরা: ইবরাহীম– ৩৯)

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ـ

হে আমাদের প্রভু, আমার প্রার্থনা কবুল করুন। (সূরা: ইবরাহীম– ৪০)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ـ

যখন তারা নৌকায় চড়ে তখন আল্লাহর দ্বীনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে তাঁর কাছে দুআ প্রার্থনা করে।

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ

হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট দুআ প্রার্থনা করে কখনো বিফল হইনি। (সূরা: মারইয়াম– ৪)

اجيب دعوة الداع اذا دعان ـ

আমি দুআ-প্রার্থনাকারীদের দুআ কবুল করি, যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে।

وما دعاء الكفرين الافى ضلال ـ

কাফিরদের দুআ গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা ব্যতীত আর কিছু নয়।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ـ

সেখানে জাকারিয়া স্বীয় প্রভুর কাছে দুআ প্রার্থনা করেন। (সূরা: আলে-ইমরান– ৩৮)

এসব আয়াতে دعا (দুআ) অর্থ দুআ-প্রার্থনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ـ

তোমাদের জন্য জান্নাতে তা-ই হবে, যা তোমাদের মন চায় এবং তোমাদের জন্য সেখানে সেটাই হবে, যেটা তোমরা কামনা করবে। (সূরা: ফুসসিলাত– ৩১)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ আয়াতে دعا (দুআ) কামনা-বাসনা অর্থে এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ـ

আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা করো, তারা তোমাদের মতো বান্দা। (সূরা: আল-আরাফ- ১৯৪)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর। তাই আল্লাহর সঙ্গে অন্য কারো পূজা করো না।

ومن اضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيمة ـ

ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে? যে আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত ওর পূজা কবুল করবে না।

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ـ

কাফিরেরা বলবে, আমাদের থেকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। বরং আমরা এর পূর্বে কোনো কিছুর পূজা করতাম না।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ـ

আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এ মুশরিকরা পূজা করে, ওগুলো কোনো কিছু সৃষ্টি করে না বরং ওগুলো সৃষ্ট, ওগুলো মৃত, জীবিত নয়।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ

মুশরিকরা যখন তাদের মাবুদগুলোকে দেখবে, তখন বলবে- হে আমাদের রব, এগুলো আমাদের সেই মাবুদ, যেগুলোকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে পূজা করতাম।

এ রকম এমন আয়াত, যেগুলোতে গায়রুল্লাহকে আহ্বান শিরক বা কুফরী বলা হয়েছে অথবা এ জন্য ধমক দেয়া হয়েছে, সেসব আয়াতে دعا (দুআ) পূজা অর্থে এসেছে এবং يدعون-এর অর্থ হচ্ছে- ওরা পূজা করে। এর ব্যাখ্যা কুরআনের ওই আয়াতসমূহে করা হয়েছে, যেসব আয়াতে دعا শব্দের সাথে عبادت বা الٰه শব্দ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ـ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

তিনিই চির জীবিত, তিনি ব্যতীত কোনো প্রভু নেই। তাঁরই ইবাদত করো মনে প্রাণে। সব সৌন্দর্য আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রভু। আপনি বলে দিন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে ওসবের পূজা করা থেকে, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা করো।

এ আয়াতে لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ এবং أَنْ أَعْبُدَ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে এখানে دعا অর্থ পূজা করা বুঝানো হয়েছে, ডাকা উদ্দেশ্য নয়।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমাদের রব বলেছেন- আমার কাছে দুআপ্রার্থনা করো, আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয় যে আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহঙ্কার করে, সে শীঘ্রই অপদস্থ হয়ে দোযখে যাবে।

এখানে دعا দ্বারা দুআ প্রার্থনা বুঝানো হয়েছে আর দুআপ্রার্থনা যেহেতু একপ্রকার ইবাদত, সে জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইবাদতের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ـ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে, যে খোদাকে ছেড়ে সেটার পূজা করে, যেটা কেয়ামত পর্যন্ত ওর কথা শুনবে না এবং যখন মানুষের হাশর হবে তখন এ দেবতাগুলো তাদের শত্রু হবে এবং ওদের ইবাদতের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

এখানেও دعا অর্থ ডাকা নয় বরং পূজা করা অর্থাৎ উপাস্য মনে করে ডাকা বুঝানো হয়েছে। কেননা এর পরপরই ওদের এ কাজকে ইবাদত বলা হয়েছে। এ আয়াতগুলোও যাবতীয় আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা, যেগুলোতে গায়রুল্লাহকে ডাকা শিরক বলা হয়েছে। যদি খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা শিরক হতো, তাহলে যেসব আয়াতে ডাকার হুকুম দেয়া হয়েছে,

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সেসব আয়াতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়ে যেত। ডাকা সম্পর্কিত আয়াত আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি। তাফসীরকারকগণ ওসব নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে دعا শব্দের অর্থ করেন– ইবাদত। তাঁরা কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহের আলোকে এ ব্যাখ্যা করে থাকেন।

আপত্তি নং-১: কোনো অভিধানে دعا শব্দের অর্থ ইবাদত আসেনি। প্রায় অভিধানে দুআর অর্থ করা হয়েছে– আহ্বান করা, ডাকা। কাজেই ওসব আয়াতে দুআর অর্থ ডাকাই হবে।

জবাব: এর দুটি জবাব রয়েছে। এক. দুআর আভিধানিক অর্থ ডাকা এবং পারিভাষিক অর্থ ইবাদত। কুরআন মাজীদে এ শব্দটি উভয় অর্থে এসেছে। যে আয়াতে ডাকার অনুমতি আছে, ওখানে দুআর আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে এবং যে আয়াতে খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকার নিষেধাজ্ঞা আছে, সেখানে দুআর প্রচলিত অর্থ অর্থাৎ পূজা বুঝানো হয়েছে। যেমন অভিধানে নামায অর্থ দুআ এবং প্রচলিত অর্থ নামায। কুরআনে أَقِيمُوا الصَّلَاةَ বাক্যাংশে সালাত দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে এবং صَلِّ عَلَيْهِمْ ও صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا বাক্যদ্বয়ে সালাত শব্দটি দুআ অর্থে এসেছে। ওদের আপত্তিটা এ রকম, যেমন– কেউ নামায অস্বীকার করে বলল কুরআনের কোথাও নামাযের কথা উল্লিখিত নেই। যেখানে সালাতের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দুআই বুঝানো হয়েছে। কারণ সালাতের আভিধানিক অর্থ দুআ। অনুরূপ তাওয়াফের আভিধানিক অর্থ চারদিকে ঘুরা আর পারিভাষিক অর্থ একটি বিশেষ ইবাদত। কুরআনে এ শব্দ উভয় অর্থে এসেছে।

দুই. এটা ঠিক যে দুআর আসল অর্থ ডাকা, কিন্তু ডাকার মধ্যে অনেক রকমফের আছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে কাউকে খোদা মনে করে ডাকা, যেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য। নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে এ অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে যেন খোদা ভেবে না ডাকে। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে করে দেয়া হয়েছে।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ -

যে খোদার সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকে, যার কোন প্রমাণ ওর নিকট নেই, ওর হিসেব আল্লাহর কাছে আছে।

এ আয়াত অতি পরিষ্কার করে বলে দিল যে ডাকার দ্বারা আল্লাহ মনে করে ডাকা বুঝানো হয়েছে।

আপত্তি নং-২: ওসব নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে دعا শব্দ দ্বারা ডাকাই উদ্দেশ্য। কাউকে দূর থেকে এ মনে করে ডাকা যে সে ওর ডাক শুনছে, এটা শিরক।

জবাব: এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কুরআনের ওসব আয়াতে দূর নিকটের কোনো কথা উল্লেখ নেই। এ শর্তারোপ ওরা মনগড়াভাবে আরোপ করেছে। আবার এ শর্ত স্বয়ং কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্যারও বিপরীত। সুতরাং এ ধরনের আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। দূর থেকে ডাকা যদি শিরক হয়, তবে সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) মদীনা মনোয়ারা থেকে হযরত সারিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু)-কে ডাক দিয়েছিলেন, অথচ তিনি তখন ছিলেন সুদূর নিহাওন্দে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাবা শরীফ নির্মাণ করে দূরের সমস্ত লোককে ডেকেছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সমস্ত মানুষের রূহ এ আওয়াজ শুনেছিল, যার বর্ণনা কুরআন মজীদে উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক নামাযী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দূর থেকে ডাকে– السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী আপনার প্রতি সালাম)। যদি এটা শিরক হয়ে যায়, তবে নামাযীর নামায শেষ হবার আগে ঈমান শেষ হয়ে যাবে। ইদানীং রেডিও, টিভির মাধ্যমে দূর থেকে লোকদেরকে সম্বোধন করে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়া হয় এবং লোকেরা তা শুনে। যদি বলা হয় যে রেডিও অথবা টিভির এ আহ্বান বিদ্যুৎ শক্তির মাধ্যমে শুনানো হয় এবং কোনো মাধ্যমের দ্বারা দূর থেকে শুনা শিরক নয়, তাহলে আমরাও বলব যে, নবুয়তের নূরের শক্তি একটি মাধ্যম এবং এ মাধ্যমের অধীনে শুনা শিরক নয়। এ আপত্তিটা একেবারে ভিত্তিহীন।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং ৩: নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে মৃতদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মৃতদেরকে এ মনে করে ডাকা যে ওরা সে ডাক শুনে, এটা শিরক।

জবাব: কয়েকটি কারণে এ আপত্তিটাও অহেতুক হবে। প্রথমত মৃতের শর্তারোপটা ওদের মনগড়া। কুরআনে এভাবে বর্ণিত নেই। আল্লাহ তায়ালা মৃত জীবিত উপস্থিত-অনুপস্থিত দূর-নিকটের শর্তারোপ করে নিষেধ করেননি। কাজেই এ শর্ত বাতিল। দ্বিতীয়ত এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআনের ব্যাখ্যার বিপরীত। কুরআনে دعا ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়ত যদি মৃতদেরকে ডাকা শিরক হয়, তবে তো প্রতিটি নামাযী মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ প্রত্যেক নামাযী নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বলে ডাকে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী আপনার প্রতি সালাম) আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন কবরস্থানে এভাবে সালাম দেয়, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَادَارَ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (হে মুসলিম পরিবারের সদস্যরা, তোমাদের প্রতি সালাম) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জবেহকৃত পাখিগুলোকে ডাক দিয়েছিলেন। পাখিগুলো ওই ডাক শুনেছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَاتِيْنَكَ سَعْيًا অতঃপর সেই মৃত পাখিগুলোকে ডাক দাও, সেগুলো তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ও হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম তাঁদের গোত্রকে ধ্বংসের পর ডেকেছিলেন। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-এর এ ঘটনা সূরা আরাফে এভাবে বর্ণিত আছে–

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ـ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ

তখন তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়েছিল, তারা স্বীয় ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। তখন সালেহ আলাইহিস সালাম ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়ে বললেন, হে আমার কওম, নিশ্চয় আমি আমার মওলার বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছেয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি। তবে তোমরা শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে পছন্দ করতে না। (সূরা: আল-আরাফ– ৭৮)

শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাও সেই সূরা আরাফে একটু আগে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

শোয়াইব আলাইহিস সালাম কাফিরদের ধ্বংসের পর তাদের থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়ে বললেন, হে আমার কওম, আমি তোমাদের নিকট আমার প্রভুর পয়গাম পৌঁছায়ে দিয়েছি, তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তাই আমি কাফির কওমের জন্য কি করে শোক প্রকাশ করব? (সূরা: আল-আরাফ– ৯৩)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে فَتَوَلَّى-এর ف বর্ণ দ্বারা (আরবি ব্যাকরণ মোতাবেক) বুঝা গেল যে পয়গাম্বরদ্বয়ের এ সম্বোধন তাঁদের কওমের ধ্বংসের পর করা হয়েছিল খোদ আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন নিহত আবু জেহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খলফ ও অন্যান্য কাফিরদেরকে ডাক দিয়ে তাদের পরিণতির কথা বলেছিলেন। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ ডাকের রহস্য জানতে চাইলে, তিনি বলেন, তোমরা এসব মৃতদের থেকে অধিক শুনো না।

বলুন, যদি কুরআনের ফত্ওয়া দ্বারা মৃতদেরকে ডাকা শিরক হয়, তবে এ নবীগণের ডাকার কী জবাব দেবে? মোটকথা এ আপত্তি শুধুই বাতিল।

আপত্তি নং-৪: কাউকে হাজত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দূর থেকে ডাকা শিরক এবং নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে এটাই বুঝানো হয়েছে। কাজেই নবী-ওলীকে হাজত পূর্ণকারী মনে করে দূর থেকে ডাকা শিরক।

জবাব: এ আপত্তিটাও ভুল। প্রথমত এ জন্য যে কুরআনের নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে এ শর্তারোপ করা হয়নি। এটা ওদের মনগড়া শর্ত। কাজেই এটা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআনী ব্যাখ্যার বিপরীত। যেমন আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। তৃতীয়ত আমি প্রমাণসহকারে বলেছি যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নূরে নবুয়তের মাধ্যমে

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হোক অথবা নূরে বেলায়েতের মাধ্যমে দূর থেকে শুনেন। আল্লাহর বান্দাগণ হাজত পূর্ণকারী আর মুশকিল আসানকারীও। যখন এ দুটি বিষয় আলাদা আলাদাভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে এগুলোর সমষ্টি কি করে শিরক হতে পারে। কুরআন বলছে, আল্লাহর বান্দা মৃত্যুর পরে শুনে এবং উত্তর দেয়, যা বিশেষ ব্যক্তিগণ অনুভব করতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

হে হাবীব, ওসব রাসূলগণকে জিজ্ঞেস করুন, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি– আমি কি খোদা ছাড়া এমন মাবুদ তৈরি করেছি, যার ইবাদত করা যায়? (সূরা: আয-যুখরুফ– ৪৫)

জেনে রাখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে পূর্ববর্তী নবীগণ বেসালপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মাহবুব, ওসব বেসালপ্রাপ্ত রাসূলগণকে জিজ্ঞেস করুন, খোদা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ আছে কি না? জিজ্ঞাসা ওকেই করা হয়, যে শুনে এবং উত্তর দেয়। এতে বুঝা গেল আল্লাহর বান্দাগণ বেসালের পর শুনেন এর কথা বলেন। মেরাজের রাতে সমস্ত বেসালপ্রাপ্ত রাসূল হুযুরের পিছনে নামায পড়েছিলেন। বিদায় হজ্জের কালে বেসালপ্রাপ্ত রাসূলগণ হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন এবং হজ্জ আদায় করেন। এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীছ মওজুদ আছে।

সারকথা হলো دعا শব্দটি কুরআন কারীমে অনেক অর্থে এসেছে। যেখানে যে অর্থ প্রযোজ্য সেখানে সে অর্থ করা চাই। অনেক ওহাবীরা প্রত্যেক জায়গায় دعا এর অর্থ– ডাকা করেছে। সেটা এমন জঘন্য ভুল যে এর ফলে কুরআনী উদ্দেশ্য কেবল ব্যাহত নয় বরং বিকৃত হয়ে যায়। যে জন্য ওহাবীদের সেই ডাকা অর্থের সাথে অনেক শর্তারোপ করতে হয়েছে। অনেক সময় বলেছে যে دعا অর্থ অদৃশ্যকে ডাকা, কোনো সময় বলেছে মৃতকে ডাকা, কোনো সময় বলেছে দূর থেকে শুনানোর উদ্দেশ্যে ডাকা, আবার কোনো সময় বলেছে মাধ্যম বিহীন শুনানোর জন্য দূর থেকে ডাকা শিরক। আশ্চর্যের বিষয়, কাউকে ডাকাটা যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তবে জীবিত, মৃত, দূর-নিকট যে কারো ইবাদত করা হোক না কেন, শিরক

হিসেবে ধরা। এতে এসব শর্ত অর্থহীন। মোটকথা এ অর্থ একেবারে ভুল। যেসব জায়গায় دعا অর্থ পূজা বুঝায়, সেখানে কোন শর্তের দরকার হয় না। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

বি:দ্র:– আল্লাহর প্রিয় পাত্রগণ বেসালের পরও জীবিতদের সাহায্য করেন। এ কথাটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

স্মরণ করো, যখন আল্লাহ পাক নবীদের থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিলেন যে আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হেকমত দান করব, অতঃপর তোমাদের নিকট সেই রাসূল তাশরীফ আনবেন, যিনি তোমাদের কিতাবসমূহের সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং ওনার সাহায্য করবে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, মিসাকের দিন আল্লাহ তায়ালা নবীগণ থেকে দুটি ওয়াদা নিয়েছেন। এক. হুযুরের প্রতি ঈমান আনা। দুই. হুযুরের সাহায্য করা। আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওসব নবীগণের কারো জীবিতবস্থায় তাশরীফ আনবেন না। এরপরও তাঁদেরকে ঈমান আনার ও সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। বুঝা গেল যে, এর দ্বারা রূহানী ঈমান ও রূহানী সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। নবীগণ ওয়াদাদ্বয় পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। মেরাজের রাতে সবাই হুযুরের পিছনে নামায পড়েছেন। এটা ঈমানের প্রমাণ। অনেক নবী বিদায় হজ্জে অংশ নেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মেরাজ রজনীতে দ্বীনে মুস্তফার সাহায্য করেছেন। তাঁর পরামর্শে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কমায়ে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন। ওসব নবীগণ মুসলমানদের ও ইসলামের রূহানী সহযোগিতা করছেন। যদি এ সাহায্য পাওয়া না যেত, তবে সেই ওয়াদা অর্থহীন হতো। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ যুগে সেই ওয়াদাকে প্রকাশ্যভাবে পালন করার জন্য স্বশরীরে তাশরীফ আনবেন।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত

কুরআন শরীফের পরিভাষাসমূহের মধ্যে ইবাদতও একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম পরিভাষা। কেননা এ শব্দটা কুরআন শরীফে অনেকবার এসেছে এবং এর অর্থে খুবই সূক্ষ্মতা রয়েছে। আনুগত্য, তাজীম ও ইবাদত-এ তিন শব্দের মধ্যে একান্ত সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। অনেকেই এ সূক্ষ্ম পার্থক্যকে গুরুত্ব দেয় না। প্রত্যেক তাজীমকে বরং প্রত্যেক ইবাদতকে ইবাদত সাব্যস্ত করে সকল মুসলমান এমনকি নিজেদের বুজুর্গগণকেও মুশরিক ও কাফির বলে ফেলে। ইবাদতের অর্থ ও এর উদ্দেশ্য খুবই মনোযোগসহকারে শুনুন।

ইবাদত 'আবদুন' শব্দ থেকে এসেছে। আবদুন অর্থ বান্দা। ইবাদতের শাব্দিক অর্থ বান্দা হওয়া বা স্বীয় বন্দেগী প্রকাশ করা, যদ্বারা খোদার খোদায়িত্ব স্বীকার করাটা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাফসীরকারকগণ ইবাদতের অর্থ একান্ত তাজীম ও একান্ত বিনয়ও করেছেন। উভয় অর্থ সঠিক। কারণ ইবাদতকারীর চূড়ান্ত বিনয়ের দ্বারা মাবুদের চূড়ান্ত তাজীম জরুরি হয়ে পড়ে এবং মাবুদের প্রতি চূড়ান্ত তাজিম থেকে ইবাদতকারীর চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ পায়। চূড়ান্ত তাজীমের সীমা হলো মাবুদের প্রতি ওই পরিমাণ তাজীম করা, যার অধিক সম্ভব নয় এবং স্বীয় বিনয় এতটুকু প্রকাশ করা, যার নিচু আর কোনো স্তর নেই।

ইবাদতের শর্ত

ইবাদতের শর্ত হল ইবাদতকারী কাউকে প্রভু এবং নিজেকে সেই প্রভুর বান্দা মনে করা। এ ধারণা নিয়ে সেই ইলাহের যে তাজিমই করা হবে, সেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। যদি কাউকে প্রভু মনে করা না হয়, বরং নবী, ওলী, বাপ, ওস্তাদ, পীর, বিচারক, বাদশাহ প্রভৃতি মনে করে তাজীম করা হয়, সেটা আনুগত্য, তাজিম, সম্মান ইত্যাদি হবে তবে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। উল্লেখ্য যে আনুগত্য ও তাজীম আল্লাহ ও বান্দা সবার হতে পারে। কিন্তু ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই, বান্দার জন্য হতে পারে না। যদি বান্দার ইবাদত করা হয়, তবে শিরক হয়ে গেল। আর বান্দার তাজীমের ব্যাপারে, যে রকম বান্দা, সে রকম হুকুম। অনেক তাজীম কুফর, যেমন গঙ্গা, যমুনা হোলি, দিওয়ালী প্রভৃতির তাজীম, অনেক তাজীম ঈমানেরই অংশ, যেমন, নবীদের তাজীম, আবার অনেক পুণ্যময় এবং অনেক তাজীম গুনাহ। এজন্য কুরআন কারীমে ইবাদতের সঙ্গে আল্লাহ বা রব বা ইলাহের উল্লেখ আছে আর আনুগত্য ও তাজীমের সাথে আল্লাহর কথাও উল্লেখ আছে এবং নবী, ওলী, মা-বাপ, বিচারক ইত্যাদির কথাও এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ـ

আপনার প্রভু ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না এবং মা-বাপের প্রতি ইহসান করো। (সূরাঃ বনী ইসরাঈল– ২৩)

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ـ

ওদেরকে আমি আর কিছু বলিনি কিন্তু সেটাই যেটার ব্যাপারে তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ– আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও আমার প্রতিপালক।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ـ

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে জনগণ, নিজেদের সেই প্রভুর ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ -

আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতা ও পিতামহ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক (আলাইহিমুস সালাম)-এর ইলাহের ইবাদত করব।

قل يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون -

বলে দিন, হে কাফিরেরা, তোমরা যাদের পূজা করো, আমরা ওদের পূজা করি না।

এ রকম সমস্ত ইবাদতের আয়াতে কেবল আল্লাহর কথা এসেছে কিন্তু আনুগত্য ও তাজীম সম্পর্কিত আয়াতে সবের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে যারা হুকুমদাতা।

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ -

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

وتعزروه وتوقروه -

নবীর সাহায্য করো এবং তাঁর সম্মান করো।

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ -

এরপর, যারা নবীর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর তাজীম করেছে এবং তাঁকে সাহায্য করেছে।

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ -

যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের তাজীম করে, সেটা আন্তরিক পরহেযগারীর পরিচায়ক। (সূরা: আল-হাজ্জ– ৩২)

মোদ্দাকথা তাজীম ও আনুগত্য বান্দারও হতে পারে কিন্তু ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। তবে ইবাদতের মধ্যে এ শর্তারোপ করা

হয়েছে যে, প্রভু মনে করে কারো তাজীম করা। সাথে সাথে এটাও জেনে রাখা দরকার যে, ইলাহ কে? এর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ আমি ইলাহের আলোচনায় করেছি যে ইলাহ হল সে, যাকে সৃষ্টিকর্তা বলে মান্য করা হয় বা সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য ভাবা হয়। সমতুল্যটা হয়তো খোদার সন্তান মনে করে হোক, বা খোদার মত স্বতন্ত্র মালিক, হাকিম, চিরজীবি ও চিরস্থায়ী মনে করে হোক অথবা আল্লাহ তায়ালাকে ওটার মুখাপেক্ষী মনে করে হোক। একই কাজ সেই আকীদা মোতাবেক হলে ইবাদত অন্যথায় ইবাদত নয়।

দেখুন, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন– আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করো। যেমন–

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

অতঃপর যখন আমি তাঁকে যথাযথভাবে তৈরি করে তার মাঝে রূহ ফুঁকে দিব, তোমরা ওনার সম্মানে সিজদায় পতিত হও। (সূরা: আল-হিজর– ২৯)

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا -

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর উঠায়ে নিলেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর সামনে সিজদায় পতিত হলেন। (সূরা: ইউসুফ– ১০০)

এ আয়াতদ্বয় থেকে যথাক্রমে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছেন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইগণ তাকে সিজদা করেছেন। অন্যান্য উম্মতদের মধ্যেও সিজদার প্রচলন ছিল, ছোটরা বড়দেরকে সিজদা করত। আবার কুরআনে এ রকম আয়াতও এসেছে–

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ -

চাঁদ-সূর্যকে সিজদা করো না। সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন। (সূরা: ফুসিলাত– ৩৭)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে সিজদা নিষেধ করা হয়েছে বরং কুফরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই উভয় প্রকারের আয়াতসমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, পূর্বের আয়াতদ্বয়ে তাজিমী সিজদা বুঝানো হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতে সিজদায়ে ইবাদতী বুঝানো হয়েছে। বান্দাদের জন্য সিজদায়ে ইবাদত কোনো সময় বৈধ ছিল না, সব সময়ের জন্য এটা শিরক হিসেবে বিবেচ্য। তবে আগের দিনগুলোতে তাজীমী সিজদা জায়েয ছিল। কিন্তু আমাদের ইসলামে সেটা হারাম এবং সিজদায়ে ইবাদতী শিরক। একই কাজ খোদায়িত্বের বিশ্বাস নিয়ে করলে শিরক, নতুবা শিরক নয়। মুসলমানগণ হজরে আসওয়াদ, মকামে ইবরাহীম ও জমজমের পানির তাজীম করার দ্বারা মুশরিক নয়। তবে হিন্দুরা মূর্তি ও গঙ্গার পানির তাজীম করার দ্বারা মুশরিক। কেননা মুসলমানদের মনে ওসব জিনিসের মধ্যে খোদায়িত্বের ধারণা নেই কিন্তু কাফিরদের মনে খোদায়িত্বের বিশ্বাস আছে।

ইবাদতের প্রকারভেদ

ইবাদত অনেক প্রকারের আছে– জ্ঞানী, আর্থিক, দৈহিক, সাময়িক ইত্যাদি। কিন্তু মূলত ইবাদত দু'প্রকার। এক. যার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। এসব কাজে কেবল আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দীর উদ্দেশ্যে করা হয়। এসব কাজে বান্দার সন্তুষ্টির কোনো স্থান নেই। দুই. যার সম্পর্ক বান্দার সাথেও এবং আল্লাহ তায়ালার সঙ্গেও। অর্থাৎ যেসব বান্দাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহর রেজামন্দীর উদ্দেশ্যে তাঁদের আনুগত্য করা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য। যেমন– পিতা-মাতার আনুগত্য, মুরশিদ ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ, প্রতিবেশীর হক পালন করা। মোট কথা যেকোনো বৈধ কাজ, যদি সে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করা হয়, তাহলে আল্লাহর ইবাদত হয়ে যায় এবং এর জন্য সওয়াব লাভ হয়। এমনকি যারা স্ত্রী-সন্তানকে উপার্জন করে এ নিয়তে খাওয়ায় যে, এটা রাসূলের সুন্নাত এবং এতে আল্লাহ রাজি হন, তাদের উপার্জনটাও ইবাদত। যারা আল্লাহর রিযিক এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন– كُلُوا وَاشْرَبُوا (খাও ও পান করো) এবং এটা নবীর সুন্নত ও ফরজ আদায় করার সহায়ক, তাদের খাওয়াটাও ইবাদত। এ জন্য আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের পানাহার, শোয়া-জাগা সবই ইবাদত হবে। এমনকি ওনাদের অশ্ব পরিচালনাও ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ـ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ـ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ـ

ওসব ঘোড়াগুলোর কসম, যেগুলো দৌড়াবার কালে বুকের আওয়াজ বের হয়। অতঃপর পদাঘাত করে পাথর থেকে আগুন বের করে। তারপর ভোর থেকেই কাফিরদের সিংহাসন ওলট-পালট করে দেয়। (সূরা: আল-আদিয়াত– ১-৩ আয়াত)

কাজেই পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করা ও তাদের আনুগত্য করাও আল্লাহর ইবাদত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য জানমাল

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরবান করা হল তাঁর আনুগত্য আর আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বরং সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত। বর্তমান আমলের ওহাবীরা সেই খোদায়িত্বের শর্ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাজীম ও সম্মানকে শিরক বলে ফেলে। তাদের মতে মিলাদ মাহফিল শিরক, মাযারে যাওয়া শিরক, ঈদের দিন উন্নত খাবার পরিবেশন শিরক যেন প্রতিটি কদমে শিরক। এরা মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কুফরীর ডঙ্কা বাজিয়ে চলছে।

আপত্তি নং-১: কাউকে হাজত পূর্ণকারী অথবা মুশকিল আসানকারী মনে করে তাজীম করা ইবাদত এবং কারো সামনে মাথানত করা ইবাদত।

জবাব: এটা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা সমসাময়িক শাসকদের এ মনে করে তাজীম করি যে, অনেক বিপদ আপদে তাদের কাছে যেতে হয়। এটা কখনো ইবাদত রূপে গণ্য নয়। বিচারক ও শিক্ষকের তাজীম এ জন্য করা হয় যে, তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। এটা ইবাদত নয়।

আপত্তি নং-২: কাউকে মাধ্যমবিহীন হস্তক্ষেপকারী ভাবা ওর তাজীম করা ইবাদত এবং এটা শিরক।

জবাব: এটাও ভুল ধারণা। ফেরেশতাগণ কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। তাঁরা প্রাণ হরণ করেন, মায়ের পেটে সন্তান তৈরি করেন, বৃষ্টি বর্ষন করেন, আল্লাহর শাস্তি নিয়ে আসেন। এ ধারণায় তাঁদের তাজীম করা কি ইবাদত? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অনুমতিতে আঙুল থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত করেছেন, চাঁদ দু'টুকরা করেছেন, ডুবন্ত সূর্যকে ফিরায়ে এনেছেন, কঙ্কর ও পাথরের দ্বারা কালেমা পড়ায়েছেন, বৃক্ষরাজি ও পশুকুল দ্বারা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর অনুমতিতে মৃতকে জীবিত করেছেন, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদেরকে শেফা করেছেন। এসব কাজ মাধ্যমবিহীন করা হয়েছে। তা হলে কি তাঁদের প্রতি তাজীম ইবাদত

হিসেবে গণ্য হবে? কখনো নয়, কেননা কেউ তাঁদের খোদার সমতুল্য ভাবে না। খোদার সমতুল্য মনে করাটাই ইবাদতের জন্য প্রথম শর্ত। তাঁরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং যা কিছু করেন, সবই আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছায় করেন। এ জন্য হযরত সালেহ, হযরত হুদ, হযরত শোয়ায়েব, হযরত নূহ ও অন্যান্য নবী স্বীয় কওমকে সর্বপ্রথম এটাই বলেছেন–

يقوم اعبد وا الله مالكم من اله غيره -

হে আমার গোত্র, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই।

অর্থাৎ আমার আনুগত্য করো, তাজীম করো, সম্মান করো, সমস্ত কওম থেকে আমাকে উত্তম মনে করো কিন্তু আমাকে খোদা বা খোদার সন্তান বা খোদার সমতুল্য বা খোদাকে আমার মুখাপেক্ষী মনে করো না এবং এ রকম ধারণা পোষণ করে আমার তাজীম করো না। কারণ এ রকম ধারণা নিয়ে কারো তাজীম বা সম্মান ইবাদত হিসেবে গণ্য। খোদা ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদত জায়েয নয়। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে কুরআন শরীফের সঠিক জ্ঞান দান করুক। এতে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোক হোঁচট খেয়ে থাকে।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دعا ও استغاثة-এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য

দুঃখ, যাতনা ও কষ্টের মধ্যে কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাই হচ্ছে, استغاثة। অপরদিকে সাধারণ আহ্বান করাকে দু'আ বলা হয়। এতে দুঃখ, বেদনা ও কষ্টের শর্ত নেই। দু'আ ও ইস্তিগাসার মধ্যে عموم وخصوص مطلق-এর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ দু'আ কেবল আহ্বান জানানোকে বলা হয়। এজন্য সকল ইস্তিগাসা দু'আ। কিন্তু সকল দু'আ ইস্তিগাসা নয়। ইস্তিগাসা ও দু'আর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই।

সূরা ফাতিহা ও সাহায্য চাওয়ার বিধান

সূরা ফাতিহায় যেমন ইসলামের অনেক আকাইদ ও শিক্ষার ধারণাকে খোলাসা করা হয়েছে তদ্রূপ সাহায্য প্রার্থনার বিধানকেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা: আল-ফাতিহা: ৪)

এ পবিত্র আয়াতটি 'সাহায্য প্রার্থনার' মাসআলার মূল ভিত্তি। যেখানে ইবাদাত ও ইস্তিআনাকে পরপর উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত কারীমার প্রথম অংশ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ইসলামের ইবাদতের বিধান আর দ্বিতীয় অংশ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ সাহায্য প্রার্থনার বিধানকে সুস্পষ্ট করছে। এটাই সে আয়াতে মুবারাকা যার প্রকাশ্য অর্থের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে কিছু লোক সকল মুসলিম উম্মাহর উপর শিরকের ফতয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

মূলত এ আয়াতের বাহ্যিক পঠনের মাধ্যমে তাদের মনে এ ধারণার হয় যে, আয়াতের উভয় অংশে অভিন্ন অর্থবোধক শব্দ এসেছে। প্রথম অংশে এসেছে ইবাদতের বর্ণনা। যা কেবল আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ইস্তিআনার বর্ণনা।

একই প্রকারের শব্দ ব্যবহারের কারণে অভিন্ন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হওয়া বোধগম্য নয়। তারা এখানে আয়াতের মাধ্যমে বাহ্যিক হালকাভাবে প্রমাণ গ্রহণ করে নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছে। সাহায্য প্রার্থনাকেও ইবাদতের মতোই শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য নির্দিষ্ট অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

যদি আমরা উক্ত আয়াতে কারীমা গভীরভাবে অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাব বাস্তবতা এর বিপরীত। দেখতে একই রকম শব্দ হলেও আয়াতে কারীমার উভয় অংশের মাঝখানে হরফে আতফ কোনো বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে? যদি ইবাদত ও ইস্তিআনা উভয়ের বিধান একই হতো তাহলে উক্ত বাক্যদ্বয়ের মাঝখানে আল্লাহ তায়ালা কখনো واو বৃদ্ধি করতেন না। এ واو আসার কারণেই তার পূর্বের ও পরের হুকুমের মধ্যে ভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে।

দুটি বাক্যের মাঝখানে থাকা ভিন্নতা নির্দেশক হরফের দরুন বাক্যদ্বয়ের আহকাম তথা বিধানের পার্থক্য বুঝা যাচ্ছে। যদি إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর মধ্যে সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত উদ্দেশ্য হতো তবে কুরআন মাজীদ এটাকে واو হরফে আতফের মাধ্যমে إِيَّاكَ نَعْبُدُ থেকে পৃথক করত না। হরফে আতফ واو এর ব্যবহার এটাই বলছে যে إِيَّاكَ نَعْبُدُ ও إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ উভয়ের প্রকৃতি আলাদা আলাদা। যদি ইবাদত ও ইস্তিআনার বিধান একই হতো তাহলে এ দুটির মাঝখানে ভিন্নতা নির্দেশক হরফে আতফ واو আনার দরকার ছিল না। বরং বাক্যটি হতো এমন إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ।

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালার বাণী হওয়ায় তার অনুপম বৈশিষ্ট্য, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার কারণে মানুষের সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এর প্রতিটি হরফের নির্দিষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। একটি হরফও অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে না। তাই যদি আলোচ্য আয়াতে ইবাদত ও ইস্তিআনার মধ্যকার ভিন্নতা উদ্দেশ্য না হতো তবে ভিন্নতা নির্দেশক হরফ কখনোই আনা হতো না। কুরআন মাজীদে এর সমর্থনে যথেষ্ট উদাহরণ এসেছে। তেমনিভাবে যেখানে ভিন্নতা উদ্দেশ্য নয় সেখানে واو আনা হয়নি। এর উদাহরণ সূরা

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতেই দেখা যায়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র বাণী–

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর; পরম দয়ালু, করুণাময়; প্রতিদান দিবসের মালিক।" (আল ফাতিহা: ১-৪)

আপনারা দেখলেন যে, ধারাবাহিকভাবে প্রথম তিনটি আয়াতেই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নামের পরে আল্লাহ তায়ালার চারটি গুণের উল্লেখ আছে। এগুলোর মাঝখানে কোনো ধরনের ভিন্নতা না থাকায় কোথাও হরফে আতফ واو নেয়া হয়নি। যদিও অন্যান্য আয়াতসমূহে যেখানে আলাদা আলাদা আমল ও কাজের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে واو হরফে আত্‌ফ নেয়া হয়েছে।

কাজেই প্রতিভাত হলো, দুআ এবং ইস্তিআনা ও ইস্তিগাসা দুটি পরস্পর ভিন্ন বিষয় এবং এগুলো একটি অপরটির স্থলে ব্যবহার বা সংমিশ্রণের চেষ্টা হচ্ছে কুরআন অবতরণের দাবির বিপরীত কাজ। যা কোনো মতেই বৈধ নয়। ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা পথভ্রষ্টতার জন্ম দেয়। বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তির জালে আটকে পড়া ব্যক্তিরা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরেই থেকে যায়। অন্যকেও বিভ্রান্তির কাদায় ডুবিয়ে দেয়। নিজের বিবেককেও ভ্রান্ত ধারণার আখড়া বানিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অর্থহীন জগৎ সৃষ্টি করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাহায্য চাওয়ার বিধান

বিশুদ্ধ ইসলামি আকীদা মোতাবেক ইস্তিআনা, ইস্তিমদাদ, ইস্তিগাসা, সুওয়াল, প্রার্থনা ও আহবানের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র সত্তাই হাকীকী সাহায্যকারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে দেব।'

যদি কেউ কুরআন মাজীদের এ মৌলিক শিক্ষা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সৃষ্টিজগতের কেউ আল্লাহ তায়ালার অনুমতি কিংবা সাহয্য ব্যতীত নিজ ইচ্ছায় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক তবে তা অকাট্যভাবে শিরক। চাই ঐ সাহায্য প্রার্থনা কোনো কার্যকারণের মাধ্যমে হোক বা কোনো কার্যকারণ ছাড়াই হোক। উভয় ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি মুশরিক বলে গণ্য হবে।

যখন এর বিপরীতে অন্যভাবে প্রকৃত সাহায্য চাওয়ার উপযুক্ত ও জবাবদাতা আল্লাহ তায়ালাকে মনে করে কোনো বান্দা কোনো কাজের জন্য বান্দার দ্বারস্থ হয়, যেমন ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করে, কিংবা ঝাড়-ফুঁক ও দুআ দরূদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কোনো সৎ বান্দার নিকট যায় তবে তা কখনোই শিরক নয়। বরং তার এ কাজ চিরন্তন সামাজিক রীতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক পবিত্র কালাম মাজীদে বহুবার মুমিনদেরকে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"এবং সৎ ও খোদা ভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না।" (সূরা: আল মায়িদাহ- ২)

উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মুসলমানকে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার নির্দেশ দেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা তখনই সম্ভব, যখন কোনো দুর্দশাগ্রস্ত মুমিন অন্য সুখী সচ্ছল মুমিনের কাছে সাহায্য চায়।

নিঃসন্দেহে এ ইস্তিমদাদ ও ইস্তিগাসা প্রাকৃতিক বিষয়াদিতে যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশের অধীন তেমনি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও। তেমনই কার্যকারণের অধীন ও কার্যকারণের উর্ধ্বে উভয়

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকার বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশকে মুতলাক তথা শর্তহীন রেখেছেন।

আর কায়িদা (মূলনীতি) হল কুরআন মাজীদের শর্তহীন কোনো বিষয়কে কোন খবরে ওয়াহিদ কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে মুকায়য়াদ (শর্তযুক্ত) করা জায়েয নয়। এখানে কোনো ব্যক্তি যদি পারস্পরিক সহযোগিতাকে (Mutual Cooperation) কার্যকারণের শর্ত লাগিয়ে মুকায়য়াদ করতে চায় তবে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা-বিরোধী কাজই হবে।

ইসলামি আহকাম ও শিক্ষার আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতার আদেশ কুরআন শরীফের পবিত্র আয়াত ও বরকতময় হাদীসসমূহে যথেষ্ট বিদ্যমান। যাতে এটা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া হয় সে যেন সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আর যাকে আহবান করা হয় সে যেন তার আহবানে সাড়া দেয় ও দুঃখী মানুষের দুর্দশা মোচন করে।

'সাহায্য প্রার্থনার' বৈধতা সম্পর্কে বহু স্থানে পবিত্র কুরআন শরীফে হুকুম রয়েছে। তাজেদারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য প্রার্থনা এমনভাবে জায়েয যেমন সাইয়্যিদুনা মূসা (আ)-এর কাছে জনৈক কিবতী এক অত্যাচারীর বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তখন মূসা (আ)ও তাকে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহর নবীগণের (আ) চেয়ে বড় তাওহীদপন্থী কে রয়েছেন? যাঁদের সারা জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাওহীদের বাণীকে পুরো বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া।

আল্লাহ পাক কিবতী ও নবী (আ) কাউকেই সাহায্য প্রার্থনা করার কারণে মুশরিক বলেননি। আল্লাহ পাক বলেন:

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

"তখন ঐ লোক যে তাঁর দলের ছিল সে মূসার কাছে সাহয্য চাইল তাঁরই বিরুদ্ধে যে তাঁর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (সূরা: আল্ কাসাস: ২৮)

আবার কুরআন মাজীদের বহু স্থানে পূর্বেকার উম্মতের মুমিনগণ কর্তৃক তাদের নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বর্ণনা রয়েছে। মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের মাঝে বিশেষত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এর প্রতি আমল প্রচলিত ছিল। অভাবীকে সাহায্য ও পরস্পর দুঃখ-দুর্দশা দূর করা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের যুগের আলোকে 'সাহায্য প্রার্থনা'

কারো বিপর্যয়ের কালে সহায়তা করা, দুঃখের সময় পাশে থাকা তার প্রতি ভালোবাসার গভীরতার পরিচায়ক। ইসলাম নিরাপত্তা ও শান্তির দাওয়াত দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হায়াতের প্রতিটি মুহূর্তই ভালোবাসার সৌরভে সুরভিত। তায়িফের দুষ্ট বালকদের পাথর নিক্ষেপের সময়ও তাঁর পবিত্র ওষ্ঠে শোভা পায় দুআর পুষ্প। রক্ত পিপাসুদের মাঝেও দয়া, করুণা, ক্ষমা ও উদারতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন মূলত ভালোবাসার উজ্জল দৃষ্টান্ত। দুঃখ-ব্যথা দূরীভূতকরণ এবং হাজত পূরণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে বড় অসিলা ও মাধ্যম আর কে হতে পারেন?

কিয়ামতের দিন যখন মানুষের উপর সবচেয়ে কঠিন সংকট আপতিত হবে, সবাই 'ইয়া নাফসী', 'ইয়া নাফসী' করতে থাকবে। মানুষ সাহায্য ও শাফায়াতের আশায় আম্বিয়া (আ) ও সৎকর্মশীল বান্দাদের স্মরণাপন্ন হবে। কিন্তু সেদিন সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) মুখ ফিরিয়ে চলে যাবেন। তখন সকলেই সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অসিলা বানিয়ে সাহায্য চাইবে। আর আল্লাহ তায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় মানুষকে সে কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

হাদীসে মুবারাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সকল মানুষ প্রথমে সাহায্যের জন্য হযরত আদম (আ)-এর নিকট যাবে। এরপর যাবে সাইয়্যিদুনা মূসা (আ) এর কাছে। সর্বশেষ খাতামুল মুরসালীন সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইস্তিগাসা করবে। হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ–

اِسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ، ثُمَّ بِمُوْسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عليه وسلم -

"লোকেরা আদম (আ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। এরপর মূসা (আ)-এর এবং সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট।" (বুখারী শরীফ)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সহীহ বুখারী শরীফে ইস্তিগাসা শব্দ সংবলিত উক্ত হাদীসের বর্ণনার দ্বারা استغاثة শব্দের উক্ত অর্থে ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষ কর্তৃক সৎকর্মশীল ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হল যে, সাহায্য প্রার্থনার অনুমতি পরকালীন জীবনে স্বীকৃত এবং যে ইস্তআনা ও ইস্তিগাসা পার্থিব জীবনে জীবিত মানুষের নিকট করা বৈধ, কবর জীবনে উক্ত সাহায্য প্রার্থনার বৈধতার উপর শিরকের অপবাদ কোন অর্থের ভিত্তিতে দেয়া হচ্ছে?

হাদীস শরীফসমূহে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বি) খাতামুন্ নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তাদের দারিদ্র্য, রোগ, বিপদ, অভাব, কর্জ ও অক্ষমতা প্রভৃতির অবস্থার উল্লেখ ও তাকে অসিলা রূপে গ্রহণ করে প্রাত্যহিক জীবনের উক্ত সমস্যাবলি দূরীকরণের আবেদন করতেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এ সুপ্ত বিশ্বাস ছিল যে, সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র একজন মাধ্যম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের কার্যকারণ। মৌলিক সম্পাদনকারী কেবল আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র সত্তা।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বরকতময় হাদীস উল্লেখ করছি যেখানে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বি) হুযুর সরওয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইস্তিগাসা করেছেন।

হজরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহায্য কামনা

সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা (রা)-এর স্মৃতিশক্তি প্রথম দিকে খুবই দুর্বল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহামূল্যবান বাণীগুলো স্মরণ রাখতে পারতেন না। এমতাবস্থায় একদিন তিনি হুযুর রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিস্মৃতিকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিলেন। এর দরুন তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম হয়ে গেলেন। হজরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি) নিজেই তাঁর এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন–

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ، قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْسِطْ رِدَاءَكَ، قَبَسَطْتُه، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّ فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَ۔

"আমি জানতে চাইলাম, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার অনেক হাদীস শুনি তবে পরক্ষণেই তা ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার চাদরটি বিছিয়ে দাও। আমি বিছিয়ে দিলাম। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (শূন্য থেকে) নিজ হাতে কিছু একটা নিয়ে চাদরে ঢেলে দিয়ে বললেন, চাদরটি তোমার গায়ে জড়িয়ে নাও। আমি চাদরটি গায়ে জড়ালাম। এ ঘটনার পর থেকে আমি কখনো কোন কিছুই ভুলে যাইনি।" (সহীহুল বুখারী, ইলম অধ্যায়: ১-২২) (সহীহুল বুখারী, সাওম অধ্যায়: ১-২৭৪)

সহীহ বুখারী শরীফের উক্ত বরকতময় হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা) চেয়ে বড় তাওহীদপন্থী আর কে আছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে বড় তাওহীদের আহবানকারী কে হতে পারেন? তথাপি সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা (রা) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রার্থনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বাধা প্রদানের পরিবর্তে তার সমস্যা চিরদিনের জন্য সমাধান করে দিলেন। কারণ একত্ববাদে বিশ্বাসী সকলেই জানে যে, প্রকৃত 'সাহায্য প্রার্থনা'র উপযুক্ত কেবল আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। আম্বিয়া, আউলিয়া, সুলাহা প্রমুখ উম্মতের সম্মানিত বান্দাগণ যাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তাঁরা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কেবল কারণ ও মাধ্যম হয়ে থাকেন। তাদের সকল তাসাররুফ আল্লাহ পাকেরই প্রদত্ত। তাঁরা মানুষের ইপ্সিত বস্তু লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাধ্যম ও অসিলা হয়ে থাকেন।

হজরত আবু হুরায়রা (রা) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে দেন। তিনি তাঁকে এ বলে ফিরিয়ে দেননি যে, যাও আল্লাহর নিকট দুআ করো এবং তাওহীদের উপর অটল থাকো। বরং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শূন্য থেকে মুঠো ভরে অদৃশ্য বস্তু নিয়ে তাঁর চাদরে ঢেলে দিলেন। আর নির্দেশ করল, এটা তোমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নাও। আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রয়োজন পূরণে এ কাজটাকে অসিলা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

প্রত্যেক সচেতন তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, প্রয়োজন ও মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা কেবল তার কাছেই করা হয় যার কুদরতী হাতে রয়েছে জগতের সমস্ত ইখতিয়ার। যখন অসিলা অন্বেষণকারীর বিশ্বাস এটা হয় যে, অসিলা ও শাফায়াতকারী ব্যক্তি আমি গুনাহগারের চেয়ে আল্লাহ তায়ালার অধিক নেকট্যপ্রাপ্ত এবং তাঁর মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার চেয়ে অনেক বেশি, তখন সাহায্যপ্রার্থী তাকে মুস্তাগাসে মাজাযীর অপেক্ষা বেশি কিছু মনে করে না। কেননা সে জানে, প্রকৃত সাহায্যকারী শুধুমাত্র মহান আল্লাহ। এ বিষয়টি আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

একজন সাহাবীর বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা

পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার দলিল এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আমল দ্বারা এর বৈধতার প্রমাণ ভরপুর। বিভিন্ন সহীহ, মারফু ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা একথা সুপ্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখনই কোনো বিপদাপদে পড়তেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যেতেন। আল্লাহ তায়ালার সমীপে তাকে অসিলা বানিয়ে দুআ করতেন। প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। যার ফলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাদের সমস্যা দূর করতেন।

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত 'হাদীসে ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা)'-কে সহীহ হিসেবে গণ্য করে ইমাম বুখারী (রা)-এভাবে বর্ণনা করেন–

عن انس ابن مالك رضى الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذا جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل الى منازلنا تمطر الى الجمعة المقبلة ـ قال: فقام ذلك الرجل أو غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ادع الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، قال: فلقد رأيت السحاب يقتطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر اهل المدينة ـ

"সাইয়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক লোক এসে বলল "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখন তো অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট বৃষ্টির জন্য দুআ করুন।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন। এজন্য আমরা জুমুআর নামায আদায় করে ঘরে ফেরার পূর্বেই বৃষ্টি শুরু হলো।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা অব্যাহত ছিল পরবর্তী জুমুআর দিন পর্যন্ত। হযরত আনাস (রা) বললেন, পরের জুমুআয় ঐ লোক বা অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের আশে পাশে (অন্য কোথাও) হোক; আমাদের উপর নয়।" তারপর আমি দেখতে পেলাম বৃষ্টি বর্ষণের সময়েই মেঘমালা ডানে-বায়ে সরে গেল। মদীনাবাসীদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইস্তিসকা: ১-১৩৮)

সাহাবায়ে কিরামের (রা) আমল দ্বারা ইস্তিসকার দলিল এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামকে (রা) এ আমল থেকে বাধা দানের পরিবর্তে তাদের হাজত পূরণ করা একথা প্রমাণ করে যে, এ আমল শিরকের ন্যূনতম সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত। কোনো সাহাবী শিরকে লিপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব তদ্রূপ এটাতো একেবারেই সম্ভব নয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা না দেওয়া।

মৃত্যুর পর সাহায্য চাওয়ার বৈধতা

সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহর সকল হুকুম এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল ভালোভাবে জানার পরও কিছু ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, পার্থিব জীবনে যেহেতু একে অপরের উপকার করা সম্ভব তাই সাহায্য চাওয়া ও সাহায্য করা দুটোই জায়েয। কিন্তু মৃত্যুর পর বান্দা যেখানে নিজেই অসহায় হয়ে যায় সেখানে তার কাছে কিভাবে সাহায্য চাওয়া যাবে? যেহেতু সে কাউকে সাহায্য করার শক্তি রাখে না তাই সাহায্য চাওয়া শিরক।

একথাটি নিঃসন্দেহে তাদের স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। এ জন্য আমরা বিশেষভাবে দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব।

প্রথম কথা হল, এটা সর্বজনবিদিত যে, বান্দা জীবিত থাকুক অথবা কবরে বিশ্রামে থাকুক কোনো ভাবেই সে তার অস্তিত্বের উপর নিজস্ব ক্ষমতার অধিকারী নয়। এটা শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। যাকে আমরা পার্থিব জীবনে ব্যবহার করছি। বিশ্বের সকল কাজকর্ম, লেনদেন করার সুযোগ পাচ্ছি। এ স্বাধীনতা মহান আল্লাহর দান।

আল্লাহ পাক যদি এ পার্থিব জীবনেই তার প্রদত্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন তাহলে বান্দা একটি তৃণ ছেঁড়ার শক্তিও রাখবে না। তাই যেভাবে কার্যকারণের ভিত্তিতে পরিচালিত এ বিশ্বে বান্দার সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালা এবং তা সত্ত্বেও কারো নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক নয় বরং আল্লাহর নির্দেশ তদ্রূপ একইভাবে মৃত্যুর পরও যদি কোনো মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তখন তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সামর্থ্যবান মনে করা হবে। জীবিত অবস্থায় যেমন কোনভাবেই বান্দাকে হাকিকি (প্রকৃত) মুস্তাগাস (সাহায্য চাওয়ার উপযুক্ত) ও মুখতার (স্বাধীন) মান্য করা শিরক তবে মাজাযী হিসেবে তাকে সাহায্যের জন্য আহবান করা বৈধ অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরও ওলী ও সালিহগণকে মাজাযী মুস্তাগাস মনে করে তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যা শিরক তা জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্যই শিরক। মাজাযী অর্থাৎ রূপক মালিক মনে করে সাহায্য প্রার্থনা জীবিত হোন বা মাজারওয়ালা হোন কারো নিকট শিরক হবে না। ইসলামের বিধানে কোনো বৈষম্য নেই। এমন নয় যে, একটি কাজ মসজিদে করলে শিরক নয় তবে মন্দিরে গিয়ে করলে তা শিরক।

ইসলামের বিধি-বিধান ও তার ফলাফল সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্য যদি কোনো ডাক্তারকে প্রকৃত মুস্তাগাস মনে কর তার কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয় তবে তা শিরক হবে।

অপরদিকে যদি আল্লাহ তায়ালাকে আসল সাহায্যকারী মনে করে কোনো বুযুর্গের দুআ কিংবা কোনো মাজারওয়ালার অসিলাকে চিকিৎসার মাধ্যম বানানো হয় তবে তা নিঃসন্দেহে সঠিক। কখনোই ইসলামি শরীয়তের পরিপন্থী নয়।

এখন অবশিষ্ট থাকল এ অভিযোগ যে, কবরবাসীদের কাছে সাহায্য করার ক্ষমতা থাকে না। এটাও ভ্রান্ত ধারণা। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে আহলুল্লাহ তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কবরের জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন।

শহীদদের হায়াত সম্পর্কে তো কোনো পথ ও মতের অনুসারীদের মধ্যেই এখতেলাফ নেই। যে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাধারণ উম্মত শাহাদাতের মর্যাদা পেয়ে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত এবং তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্ক পাঠানো হয় সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের জীবনের বাস্তবতা কেমন হতে পারে?

কাজেই বেসাল পরবর্তী জীবনের আকীদার ভিত্তিতে সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাজাযী মুস্তাগাস মনে করে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এমনভাবে বৈধ যেমন তার পবিত্র জাহেরী (প্রকাশ্য) হায়াতের মধ্যে বৈধ ছিল।

এমনকি তাঁর কবরের জীবনের বাস্তবতা হলো, উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালামের যে উপঢৌকন পাঠানো হয় তা দিবানিশি তাঁর নিকট পৌঁছানোর জন্য একদল ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন।

যদি শাফাআত প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা ও অসিলা গ্রহণ কুফর ও শিরকের পর্যায়ভুক্ত হতো তবে পৃথিবীতে, কবরের জীবনে এবং পরকালে সর্বক্ষেত্রেই তা কুফর ও শিরক হওয়াই যৌক্তিক ছিল। কারণ শিরক সর্বাবস্থায় আল্লাহর অপছন্দনীয়।

মূল কথা হচ্ছে, তা কখনোই শিরক নয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, জীবিত অবস্থায় যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা) অনেক সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও অসিলা গ্রহণ করেছেন তদ্রূপ আখিরাত ও কিয়ামতের দিন তাঁর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবেন। এ ইস্তিগাসার ফলস্বরূপ শাফীউল মুযনিবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকট পাপী বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

এজন্য যেহেতু পার্থিব ও পরকালীন উভয় জীবনে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ প্রমাণিত হলো সেহেতু উভয় প্রকার হায়াতের মধ্যম পর্যায় কবরের জীবনেও তাকে শিরক বলা কিভাবে জায়েয হবে?

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবর-জীবন সম্পর্কিত প্রমাণ

মৃত্যু পরবর্তী জীবন অর্থাৎ কবরের জীবনের সত্যতা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থানের ন্যায়ই সত্য।

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ পাক বলেন:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"কীভাবে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা: আল-বাকারা– ২৮)

এ আয়াতে কারীমায় দু'বার মৃত্যু দু'বার জীবন লাভ সর্বশেষ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের সামনে পুনরুত্থানের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

আয়াতে কারীমার আলোকে প্রথম মৃত্যু হল আমাদের সৃষ্টির পূর্বের অস্তিত্বহীনতা। এরপর জীবন মানে হচ্ছে আমাদের পার্থিব জীবন। এরপর আসবে মৃত্যু। তখন অন্যরা যথাযথভাবে আমাদের কাফন-দাফন করবেন। মৃত্যুর পরের এ জীবনকে কবরের জীবন বলা হয়। প্রত্যেক মানুষই কবরে এ জীবন লাভ করে। তখন ফেরেশতারা বিভিন্ন প্রশ্ন করার জন্য হাজির হন। জান্নাত বা জাহান্নামের একটি জানালা কবরে খুলে দেয়া হয়। এ দ্বিতীয় জীবনের পর হাশরের দিন আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নিকট উপস্থিত করা হবে। উক্ত কবরের জীবনের স্থায়িত্ব হচ্ছে কবরের মধ্যে প্রশ্নমালা নিয়ে ফেরেশতাদের আগমনের কাল থেকে হাশরের দিন ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত।

এটা হল সাধারণ মানুষের কবরের জীবনের ব্যাপার (মুসলমান হোক বা অমুসলিম)। এবার দেখুন শহীদদের জীবন সম্পর্কে সূরা বাকারার অন্য একটি আয়াত–

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। তবে তোমরা তা বুঝো না।" (সূরা: আল-বাকারা– ১৫৪)

এ বিষয়টিকে সূরা আলে ইমরানে অসংখ্য শব্দের মাধ্যমে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত।" (সূরা: আলে-ইমরান: ১৬৯)

শহীদদের জীবনকে প্রত্যেক মতের অনুসারীরাই সমর্থন করেন। এমনকি উল্লিখিত আয়াতে কারীমা ব্যতীত অসংখ্য হাদীসে কাফির ও মুশরিকদের মৃত্যুর পর জীবন এবং মৃত্যুর পর জীবিত লোকদের কথা শোনার প্রমাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ বদর যুদ্ধের পর সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিহত কাফির ও মুশরিকদের নাম ধরে ডেকেছেন এবং তাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন–

فَإِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখতে পেয়েছি। (হে কাফির ও মুশরিকরা) তোমরাও কি তোমাদের প্রভুর অঙ্গীকারের সত্যতা পেয়েছ?"

এ সময় সাইয়্যিদুনা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ আবেদন করলেন, হুযুর আপনি কতগুলো নিষ্প্রাণ দেহের সাথে কথা বলছেন?

তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ -

"ওই মহান প্রভুর কসম, যার কুদরতী কব্জায় আমার প্রাণ! আমি কাফির ও মুশরিকদের সাথে যেসব কথা বলছি তা তারা তোমাদের অপেক্ষা বেশি শুনতে পাচ্ছে।" (সহীহুল বুখারী কিতাবুল মাগাযী ২: ৫৬৬)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সহীহ বুখারীর এ পবিত্র হাদীসে কাফির ও মুশরিকদের মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনের শ্রবণশক্তি কেবল সাধারণ জীবিত মানুষ নয় বরং জীবিত সাহাবীদের (রা) শ্রবণ শক্তির অপেক্ষাও বেশি বলা হচ্ছে।

একইভাবে সমগ্র জাহানের কল্যাণকারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে গমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দেন যে, তারা যেন কবরবাসীদেরকে 'ইয়া' (হে) বলে সম্বোধন করে সালাম দেয়। এজন্যই মুসলমানরা তাদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে যেন অবশ্যই "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর" বলে।

যেহেতু কাফির ও মুশরিকদের জীবন, সাধারণ মুমিনদের জীবন আর শহীদ ও সালেহীনের জীবন আপন আপন অবস্থার আলোকে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত, তখন নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম হায়াতকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পবিত্র জবানে অসংখ্যবার এ ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ -

"আল্লাহ পাক মাটির জন্য নবীদের শরীর ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) জীবিত। তাঁদের নিকট রিযক পাঠানো হয়।" (সুনান্ আন নাসাঈ; সুনান্ আবূ দাউদ; সুনান ইবনে মাজাহ শরীফ)

এ পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের কবরসমূহে জীবিত থাকেন। একটি বরকতময় হাদীসে তো এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উম্মতের সমস্ত আমল পেশ করা হয়। নেক আমলগুলোর জন্য হুযুর

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। মন্দ আমলের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর খেদমতে উম্মতের মাগফিরাত কামনা করে দুআ করেন। হাদীসের শব্দাবলি নিম্নরূপ–

تُعْرِضُ على اعما لكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم -

"তোমাদের আমলগুলো আমার নিকট পেশ করা হয়। যখন তা ভালো হয় তখন আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি। আর আমলগুলো মন্দ হলে আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের জন্য মাগফিরাত চেয়ে দু'আ করি।" (মাজমাউয্ যাওয়াইদ)

সে আল্লাহ (যুল জালাল) যিনি এ বিশ্বে এবং আখিরাতে সমস্ত মানুষকে জীবন এবং রিয্ক দানের শক্তি রাখেন তিনিই আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস সালাম)-কে কবরের মাঝেও জীবিত রাখতে ও রিয্ক দানে ক্ষমতাবান।

ইসলামি সাহিত্যে ঢুকে পড়া গ্রীক দর্শনে রূহের কবরের জীবন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অবান্তর ও অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো ইসলামের চিরন্তন, অবিকৃত ও বাস্তবভিত্তিক মজবুত মূলনীতির সামনে গুরুত্বহীন।

ইসলামি বিধি-বিধান পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে হায়াতের প্রকারভেদ আর কবরের হায়াতপ্রাপ্ত মানুষকে আহবান করার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শিক্ষাকে উপস্থাপন করছে। সুস্পষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে একথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) শহীদগণ, সালিহগণ সাধারণ মানুষ এমনকি কাফির মুশরিকরাও তাদের স্ব-স্ব কবরে জীবিত। শহীদদের কাছে কবরের রীতি মোতাবেক রিযক পৌঁছানোর ব্যাপারে কুরআন মাজীদ নিজেই সাক্ষী।

তাই যারা পার্থিব জীবনে ইস্তগাসাকে বৈধ মনে করে মৃত্যু পরবর্তী ইস্তিগাসাকে হারাম বরং শিরক বলে গণ্য করছে তাদের উদ্দেশে একথাই বলা যায়, মৃত্যু হল এক মুহূর্তের আস্বাদন যা নিমিষেই চলে যায়।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

هوت تجدید مذاق زندکی کا نام هـ

نواب کـهردم مین بیداری کااك بغام هـ

"মৃত্যু হল জীবনের স্বাদ নবায়নের নাম, স্বপ্নের আবরণে জাগরণের পয়গাম।"

পার্থিব জীবন ও কিয়ামতের দিবসে প্রাপ্ত পরকালীন জীবনের মধ্যকার জীবন হল কবরের জীবন। এ জন্য পার্থিব ও পরকালীন জীবনপ্রাপ্ত মানুষের নিকট যেমন ইস্তিমদাদ, ইস্তিআনাত ও ইস্তিগাসা করা বৈধ অনুরূপভাবে কবরের জীবন প্রাপ্তদের নিকটও ইস্তিগাসা বৈধ। এর মধ্যে শিরকের বিন্দুমাত্র সন্দেহও অনুপস্থিত। কেননা, দুনিয়া, কবর ও আখিরাত তিন জীবনেই আল্লাহ তায়ালাকে মূল মুস্তাআন এবং বান্দাকে রূপক মুস্তাগাস মেনে ইস্তিগাসা করা যায়। আর তা জায়েয।

উল্লিখিত তিন জীবনের কোনোটিতেই বান্দাকে আসল মুস্তাগাস মনে করা অকাট্যভাবে শিরক। জীবনের ভিন্নতার কারণে নয় বরং হাকীকত ও মাজাযের পার্থক্যের ভিত্তিতেই শিরকের হুকুম প্রমাণিত হয়।

"রূহ"-এর হায়াত ও ক্ষমতার আলোচনা

অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের "রূহ"-এর কবরের জীবন প্রমাণিত হওয়ার পর মৃত্যুর পরবর্তী ইস্তিগাসাকে অবৈধ মনে করা অজ্ঞতা বা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। নবী ও সালিহগণের রূহের কাছে সাহায্য চাওয়া কোন জীবিত মানুষ বা ফেরেশতার নিকট সাহায্য চাওয়ার মতই সঠিক। যখন আমরা জীবিত কোন মানুষের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হই তখন বাস্তবে তার রূপের নিকটই সাহায্য চেয়ে থাকি। মানুষের শরীরটা হচ্ছে মানুষের রূহের পোশাক মাত্র। মৃত্যুর পর যখন রূহটা মানবদেহের পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন তা মাটির তৈরি শরীরের সীমাবদ্ধতা থেকেও মুক্ত হয়। এজন্য তা ফেরেশতাদের মতই কিংবা আরো বেশি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কাজ করতে পারবে। আমাদের বস্তুজগতে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য যেসব নিয়ম কানুনের প্রয়োজন হয় "রূহ" সে সবের বহু উর্ধ্বে। কারণ রূহের জগত হলো "আলমে আমর"। তা শরীরের এ কার্যকারণের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي -

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত।" (সূরা: আল ইসরা- ৮৫)

কবরের মধ্যে রূহগুলো আলমে আমরের যে জীবন লাভ করে সেখানে সে পৃথিবীর শারীরিক জীবন থেকে বহুগুণ বেশি কাজ করার শক্তি পায়। তাদেরকে আহবানকারী এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থীদেরকে সাহায্য করতে পারে।

যদি সাহায্য প্রার্থনাকে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান ক্ষেত্রে বৈধ ভাবা হয় তবে তা ঈমানের চাহিদা নয় বরং মনগড়া দর্শনের নিকট আত্মসমর্পণ। কারণ প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র ঈমানের সূক্ষ্ম রহস্যাবলির সমর্থক নয়। ঈমানের রহস্যাবলি জানার জন্য অন্তরের স্বচ্ছতা ও নিখুঁত প্রেমের দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, নবী ও সালিহগণ সাহায্য প্রার্থীদেরকে সাহায্য করার অর্থ হল, তাঁরা সাহায্যের ভিখারীদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেন। আর আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাদের দু'আকে কবুল করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দরকার পূরণ করেন। এটা হচ্ছে কোনো বয়স্ক লোক ছোট ছেলের জন্য কিংবা ভাই অপর ভাইয়ের জন্য দু'আ করার মতই সহজবোধ্য ও সঠিক। সমস্যা হল বিরুদ্ধবাদীরা কবরবাসীদের জীবনকে অস্বীকার পূর্বক তাদের দু'আ করার যোগ্যও মনে করে না। অথচ বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা হল যে, তারা জীবিত। নিজ অনুভূতি ও বিবেকের মাধ্যমে জিয়ারতকারীদের চিনতে সক্ষম। শরীর থেকে মুক্ত হওয়ার পর "রূহ"-এর অনুভূতি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মানবীয় প্রবৃত্তি দূর হওয়ার দরুন মৃত্তিকার আবরণ সরে যায়।

সাহায্য প্রার্থনাকে এভাবেও বোঝা যায় যে, যার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তিনি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী এমনভাবে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় সে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রয়োজন পূরণের আশাবাদী। সে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অসিলা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করে, আমি এ ওলী ও সালিহগণের প্রেমিকদের একজন। তাই তাদের ভালোবাসা ও নৈকট্যের দরুন বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের হকদার। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাজেদারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা দুআর মধ্যে উল্লিখিত আউলিয়ায়ে কিরামের অসিলায় সে ব্যক্তির ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন। তার প্রয়োজন পূরণ করেন।

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায আদায়কারীদের ক্ষমা-প্রার্থনাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ জানাযায় উপস্থিত লোকেরা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট মৃত ব্যক্তির ক্ষমা লাভের অসিলা বানায় এবং তার সাহায্যকারী হয়ে যায়।

হাকীকত ও মাজাযের স্বাতন্ত্র্যতা জরুরি

সাহায্যপ্রার্থনা বিরোধীদের একটি দলের মত হল, স্বাভাবিক কার্যকারণের অধীন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ। তথাপি এখানে হাকীকত ও মাজাযের কোনো গুরুত্ব নেই।

এখন উক্ত মতের সমর্থকদের নিকট প্রশ্ন যদি স্বাভাবিক বিষয়সমূহে সাহায্য প্রার্থনাকে বৈধ ও সঠিক মনে করা হয় এবং হাকিকি ও মাজাযী সাহায্য প্রার্থনা বলতে কিছু না থাকে তবে এসব বিষয়ে মূল সাহায্যকারী কে হবেন?

যখন কোনো রোগী ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার জন্য যায় তখন প্রকৃত সাহায্যকারী কে হবেন? মূল সাহায্যকারী কি ঐ ডাক্তার যিনি রোগীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন? না আল্লাহ পাক?

যদি এর উত্তর এটা হয় যে দুনিয়াবী বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালা তাহলে স্বাভাবিক ও অলৌকিক বিষয়ের মাঝে পার্থক্য কী থাকল? একই সাহায্য প্রার্থনা অলৌকিক ব্যাপারে শিরক আর স্বাভাবিক বিষয়ে জায়েজ? এ মূলনীতি কোথা থেকে এলো যে, হাকীকত ও মাজাযকে না মেনে সাধারণভাবে আল্লাহকেই সাহায্যকারী মনে করে আবার অন্যের নিকট সাহায্যের জন্য হাত বাড়ানো যাবে?

অথচ কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে–

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ـ

"আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা: আল-আম্বিয়া– ১১২)

যদি এর উত্তর এভাবে দেয়া হয় যে, স্বাভাবিক বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালা নন মানুষই; তাহলে প্রকৃত সাহায্যকারী একাধিক হয়ে যায় যা নিঃসন্দেহে শিরক। তথা দুনিয়াবী কাজকর্মে সাহায্যকারী হবে বান্দা আর অলৌকিক বিষয়ে সাহায্যকারী আল্লাহ পাক?

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ দুয়ের ভিত্তিতে যখন বান্দাকে সাহায্যকারী মানা হলো তখন এটা ঐ পর্যায়ের শিরকের মাঝে গণ্য হবে যা মক্কার কাফির ও মুশরিকদের মাঝে প্রচলিত ছিল। তারা দুনিয়াবী বিষয়ে বান্দাকে সাহায্যকারী মনে করত এবং অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ পাককে সাহায্যকারী মানত। যদি একথা বলা হয় যে, দুনিয়াবী বিষয়েও আল্লাহ তায়ালাই মুস্তাআন; তাহলে অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া কিভাবে বৈধ হলো?

বিচার্য বিষয় হচ্ছে, বিরুদ্ধবাদীদের মতে স্বাভাবিক বিষয়ে আসল সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালা কি আল্লাহর সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা শুধু বাহ্যিক ও মাজাযী অর্থে করা হয়। হাকিকি অর্থে নয়। এখন প্রশ্ন জাগে যদি স্বাভাবিক কার্যকারণের অধীন বিষয়ে অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া মাজাযী ইস্তিগাসা হওয়ার কারণে জায়েয হয় তাহলে অলৌকিক বিষয়ে মাজায হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে হারাম হয়ে গেল? কিন্তু সেখানেও ইস্তিগাসা হাক্বীক্বি নয় মাজাযীই ছিল।

অলৌকিক বিষয়ে রূপকের বৈধতা

অলৌকিক বিষয়ে মাজাযের ব্যবহার এ দৃষ্টিকোণ থেকেও জায়েজ যে, তা বাহ্যিকভাবে যদিও ইস্তিগাসা কিন্তু এর দ্বারা তাওয়াস্‌সুলের অর্থও নেওয়া যায়। আসল মুস্তাআন মনে করা হয় আল্লাহ তায়ালাকেই। মাজাযী অর্থে ইস্তিগাসার ব্যবহার কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে এসেছে। তার মধ্যে অধিকাংশ মাজাযের ব্যবহার হয়েছে অলৌকিক বিষয়ের জন্য। কুরআন মাজীদে মাজাযের যে বহুল ব্যবহার দেখা যায় হয় তা থেকে কয়েকটা স্থানের উল্লেখ আমরা এখানে করব। যেন পাঠকের বিবেক ও অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে হাকিকত ও মাজাযের অস্বীকারের ফলাফল কত ভয়াবহ হতে পারে।

জিবরাঈল (আ)-এর ঘটনা

হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর হুকুমে সাইয়্যিদুনা ঈসা (আ)-এর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনায় হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট মানবীয় আকৃতিতে এসে বললেন–

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ـ

"(সে বলল) আমি তো কেবল তোমার পালনকর্তার প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব।" (সূরা: মারয়াম– ১৯)

উপরোল্লিখিত আয়াতে জিবরাঈল আমীন (আ)-এর উক্তি অলৌকিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যতীত সন্তান জন্ম লাভ করা এবং এমতাবস্থায় এটা বলা, "আমি তোমাকে একজন পবিত্র পুত্র সন্তান দান করব" অলৌকিক বিষয়ে সাহায্য করার বড় কুরআনী উদাহরণ। সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি ছাড়া এ পৃথিবীতে এর কল্পনাও অসম্ভব।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল যদি কোনো ব্যক্তি কেবলমাত্র তাওয়াস্‌সুলের নিয়মে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কোনো সম্মানিত বান্দার অসিলা দিয়ে সন্তান কামনা করে তখন কিছু মূর্খ বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে শিরকের ফতওয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর যখন জিবরাঈল (আ) (যিনি খোদা নন) বলেন, আমি পুত্র সন্তান দান করব, আর আল্লাহ তায়ালাও খোদ তা কুরআন মাজীদে স্থান দেন তখন এটাও অনুরূপ শিরক হবে না? উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনকারী মানুষ। কিন্তু দাতা যদি বলেন যে, 'আমি তোমাকে পুত্র সন্তান দিব' তখন এ বাক্যকে যদি রূপক অর্থে গ্রহণ করা না হয় তাহলে বাস্তবিকপক্ষে তিনি খোদা হওয়ার সমার্থক। সন্তান দান করা আল্লাহর কাজ। বান্দার কাজ হল তার দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে চাওয়া যদি শিরক হয় তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যদি বলে যে, আমি সন্তান দিব তবে তা আরো বেশি শিরক হিসেবে গণ্য হওয়াই উচিত। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জিবরাঈল আমীন (আ) لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا বলার পরও মুশরিক হলেন না বরং তার উক্তি সত্যই থাকল তবে এ উক্তির কী ব্যাখ্যা হবে?

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জবাব: এ উক্তি যদিও রূহুল আমীন (আ)-এর অর্থাৎ "আমি পুত্র সন্তান দান করব" তবে এর অর্থ হল ঐ সন্তান যা আল্লাহ পাক দান করবেন আমি তাঁর কার্যকারণ তথা মাধ্যম ও অসিলা হলাম। সুতরাং উক্ত আয়াতে কারীমায় لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا-এর মধ্যে সাহায্য করার আমল পাওয়া গেলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্যে তাওয়াস্সুল অর্থাৎ অসিলা গ্রহণ। আর তাঁর পুত্র সন্তান দানের উক্তিটি কুরআন কারীমে মাজাযের (রূপকার্থ) ব্যবহারের উত্তম দৃষ্টান্ত।

অহেতুক আকিদাগত ফিতনার খণ্ডন

মনগড়া যুক্তির প্রতারণাই এ মাসআলাকে বিভ্রান্তির মাঝে আটকে রেখেছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এখানে যাকে অদৃশ্য ক্ষমতা বলে নামকরণ করা হল তা মূলত রূহানী (আধ্যাত্মিক) শক্তি । যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাদেরকে দান করেন। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এ রূহানী শক্তি ও ক্ষমতাকে অদৃশ্য ক্ষমতা নাম দিয়ে অনেক বড় আকিদাগত ফিতনার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অদৃশ্য ক্ষমতার আসল অর্থ তো কখনোই নয় যা সাধারণভাবে ইস্তিগাসার বিরোধিতার জন্য বর্ণনা করা হয়। কেননা, আমরা দেখি এ ধরনের ক্ষমতা তো সব মানুষ এমনকি অমুসলিমদের নিকট আছে। অদৃশ্য ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপ এ যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সর্বশেষ সংযোজন ইন্টারনেটকে উল্লেখ করতে পারি। বস্তুগত উন্নতির এ বিজ্ঞানময় পৃথিবীতে Global Village (বিশ্বায়ন) এর আধুনিক চিন্তাধারা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। কম্পিউটারের জগতে সকল ব্যবধান ও দূরত্ব কমে আসছে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রায় এক কোটি কম্পিউটার বিস্তৃত ইন্টারনেট সমগ্র পৃথিবীকে একটি সরিষার দানার মত সংকুচিত করে ফেলেছে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের উন্নতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যেকোনো সাধারণ মানুষ বদ্ধ কক্ষে বসে নিজের হাতের তালুতে রাখা সরিষার দানার ন্যায় সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পারে। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ইন্টারনেট ও তার সঙ্গে সংযুক্ত অসংখ্য কম্পিউটার নামক অনুভূতিহীন যন্ত্রগুলো কি অদৃশ্য ক্ষমতার মালিক? মানুষের মেধা দিয়ে উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলকে

অদৃশ্য ক্ষমতা ও শিরক বলা হয় না। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত রূহানী শক্তিকে অস্বীকার করার মানসে ভিত্তিহীন ও কল্পিত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাকে অদৃশ্য ক্ষমতা নাম দিয়ে শিরক প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল রূপে অসম্ভব বস্তু সম্ভব হওয়া এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে সংঘটিত ঘটনাবলি মুহূর্তেই বিশ্বময় পৌঁছে যাওয়া যদি তাওহীদের বিরোধী না হয় তাহলে রূহানী কার্যকারণের শক্তির প্রকাশও কখনোই শিরকের সুযোগ রাখে না।

কাফির ও মুশরিকদের আবিষ্কৃত প্রযুক্তির কল্যাণে প্রাপ্ত ক্ষমতা যদি শিরকের কারণ না হয় তবে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত রূহানী ক্ষমতা ও প্রভাবকে সম্মানিত নবী, ওলী ও সালিহগণের প্রতি সম্পর্কিত করলে শিরক বলা যায় কোন যুক্তিতে?

আধুনিক আমলের বস্তুগত উৎকর্ষের ক্ষমতা আপন জায়গায় থাকুক। কিন্তু তাজেদারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামদের সামর্থ্য, তাদের রূহানী উন্নতি ও পরিপূর্ণতা তো এর বহু উর্ধ্বে। সে রূহানী শক্তির জোরেই সরকার গাউসে আযম সাইয়্যিদুনা আবদুল কাদির জিলানী (র) বলেন–

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا ـ كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَال

অর্থাৎ, "আমি আল্লাহর পুরো সৃষ্টিজগতকে আমার হাতের তালুতে রাখা একটি সরিষার দানার মত দেখি।"

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

এক্ষেত্রে অনেকে এমন ধারণাও পোষণ করে যে, যখন দূর থেকে কাউকে কোনো কাজের জন্য আহবান করা হয় তখন বুঝা যায় যে, তিনি সেখান থেকেই জানতে পারেন, কে তাঁকে ডাকছে। তখন তিনি আহ্বানকারীকে চিনতে সক্ষম হন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে তাঁর কাছে ইলমে গায়েব (অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান) আছে। যেহেতু ইলমে গায়েব থাকা শুধু আল্লাহ তায়ালারই ক্ষমতার অংশ এ জন্য উক্ত দুটি কারণে এটা (ইস্তিগাসা) শিরক ও হারাম।

উক্ত কথার সরল উত্তর হল, আমরা এ যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলস্বরূপ এ ধরনের ইলম সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি। অপরদিকে কালামে মাজীদ ফুরকানে হামীদে এ দুটি গুণ গায়রুল্লাহর জন্য প্রমাণিত। তথাপি তা শিরক নয় বরং আল্লাহর কালাম। এতে দূর থেকে জানা, কাজ করার শক্তি উভয়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

'সূরা নামল'-এ সাইয়্যিদুনা সুলাইমান (আ) তাঁর সভাসদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে বলেন–

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

"হে সভাসদগণ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে।" (সূরা: আন-নামল– ৩৮)

বিলকীসের সিংহাসন ছিল জরত সুলাইমান (আ)-এর দরবার থেকে নয় শ' মাইল দূরে। যা দরবারের কেউ দেখেনি। তারপরও কেউ তাঁর নিকট এটা জিজ্ঞাসা করলেন না, 'হে সুলাইমান (আ), সিংহাসন তো শত শত মাইল দূরে। দৃষ্টির বাইরে। আপনি বলছেন তা দরবারে উপস্থিত করতে। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আমরা এখানে বসেই দূরের বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখি? আমাদের কাছে ইলমে গায়েব আছে?

মাখলুকের নিকটও দূরের ইল্‌ম থাকতে পারে

যদি সুলাইমান (আ) এ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, নয় শ' মাইল দূরে থাকা বিলকীসের সিংহাসন সম্পর্কে তার সভাসদদের মধ্যে কোনো ধারণা নেই অর্থাৎ তা কোন্ স্থানে এত দূরে গিয়ে তা কিভাবে আনা যাবে তাহলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন না কে নিয়ে আসবে? আল্লাহ পাকের নিকট আরজ করতেন, "হে আল্লাহ, বিলকীসের সিংহাসন আমার কাছে এনে দাও। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান।"

সংক্ষেপে কুরআন মাজীদ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই– দূরের বস্তু সম্পর্কে জানতে পারা শিরকের পর্যায়ে পড়ে না। কাজেই যদি সুলাইমান (আ) এ বিশ্বাস রাখেন, তাঁর উপর ভিত্তি করে সভাসদদেরকে সিংহাসন হাজির করার নির্দেশ দেন তারপরও তিনি মুশরিক না হন তবে যদি বর্তমান যুগের মুসলমানরা এ আকিদা পোষণ করেন যে, গাউসে আযম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র), দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজবেরি (র), হযরত সুলতানুল আরেফীন সুলতানু শিহাবুদ্দীন সরোওয়ার্দি (র) সহ অপরাপর আউলিয়ায়ে কামিলীন ও সুলাহায়ে ইজাম (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) প্রমুখ আমাদের ব্যাপারে জানেন এবং আমাদের দুরবস্থা আল্লাহর হুকুমে শোনার ক্ষমতা রাখেন তবে কীভাবে শিরক হবে? যেসব কারণ হযরত সুলাইমান (আ)-এর ব্যাপারে শিরক হয়নি একই কারণে এখানেও শিরক হবে না। কারণ আউলিয়ায়ে কিরামকে প্রদত্ত 'কাশ্‌ফ'ও ঐ মহান সত্তাই দান করেছেন যিনি সুলাইমান (আ)-এর দরবারের লোকদের বিশেষত "আসিফ বরখিয়া"-কে দান দিয়েছেন। এখনও সর্বশক্তিমান সে মহান সত্তাই আছেন যিনি সাইয়্যিদুনা সুলাইমান (আ)-এর আমলে ছিলেন। তাই বর্তমানেও শরীয়তের আহকাম অভিন্ন থাকবে। ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস সৃষ্টির করার কী প্রয়োজন?

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাশ্‌ফে ফারূকী

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাদেরকে প্রদত্ত রূহানী শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের এবং অজ্ঞাত বস্তু-স্থানের মধ্যকার যাবতীয় আবরণ দূর হয়ে যায়। এটা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের বিশেষ দানের অন্তর্ভুক্ত রূহানী ফয়জেরই পূর্ণতা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোনো ধরনের বস্তুগত মাধ্যম গ্রহণ করা ছাড়াই হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইসলামি সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে দিক নির্দেশনা দানে সক্ষম ছিলেন। সাইয়্যিদুনা সারিয়াহ ইবনে জাবাল (রা)-এর নেতৃত্বে ইসলামি সেনাবাহিনী ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করেছিলেন।

অপর দিকে শত্রুরা কৌশলে মুসলিম সৈন্যদলকে ঘেরাও করে অতর্কিত হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় খলীফাতুল মুসলিমীন সাইয়্যিদুনা উমর ফারুক (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। রূহানী দৃষ্টির বদৌলতে যুদ্ধের ময়দানের নকশা তাঁর সামনে ছিল। খুতবা চলাকালেই উচ্চ স্বরে ডাক দিলেন–

يَاسَارِيَ الْجَبَلَ -

"হে সারিয়া! পাহাড়ে উঠে যাও।" (মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফ)

এটা বলেই তিনি আবার খুতবার মধ্যে মশগুল হয়ে গেলেন। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মসজিদে নববীতে জুমুআর খুতবাও দিচ্ছেন আবার তার অধিনায়ককে যুদ্ধের মাঠে দিক নির্দেশনাও দিচ্ছেন। তাঁর কাছে না কোনো রেডিও ছিল না কোন মোবাইল ফোন– যার দ্বারা রণাঙ্গণে খবরাখবর যথাসময়ে পাওয়া সম্ভব। এটা ছিল শুধু আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের প্রদত্ত রূহানী শক্তি ও ক্ষমতা। যার সাহায্যে তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতে পেয়েছেন।

হযরত সারিয়া ইবনে জাবাল (রা) সাইয়্যিদুনা ফারূকে আজম (রা)-এর আহ্বান শুনলেন এবং তার নির্দেশমতো পাহাড়ে চড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনলেন। শত্রুদের হামলা ব্যর্থ হয়ে গেল। মুসলিম সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের ফলে বিজয় তাদের পদচুম্বন করল।

কাশ্‌ফ ও ইলমে গায়েবের মাঝে প্রভেদ

এখানে আমরা একটি বিভ্রান্তির নিরসন করতে যাচ্ছি। কাশফ ও ইলমে গায়েব দুটি আলাদা বিষয়। ইলমে গায়েবের বিপরীতে কাশফের মধ্যে শুধু কোনো অজ্ঞাত বস্তু থেকে পর্দা-আবরণ সরে যাওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। আর তা কেবল মাখলুকের জন্যই প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালার জন্য তো কাশ্‌ফ নামের কোনো কিছুর কল্পনাও অসম্ভব। কারণ তিনি হচ্ছেন, 'আলিমুল গায়বি ওয়াশ্‌ শাহাদাতি।' যেহেতু তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন বা পর্দাবৃত নয় তাই কাশ্‌ফ তথা পর্দা উন্মোচনের প্রশ্নই আসে না।

কাশ্‌ফের সম্পর্ক আল্লাহর ওলীদের প্রতি হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সৎ ও পুণ্যবান বান্দাদের যে যোগ্যতা প্রমাণিত হয় তা আল্লাহর জন্য কল্পনা করাও শিরক। যে বিষয়কে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা অসম্ভব তাকে গায়রুল্লাহর প্রতি সম্পর্কিত করলে শিরক হবে কিভাবে?

ওলীদের নিকট গায়বের বিষয়গুলো পর্দাবৃত থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ঐ পর্দাগুলো উন্মোচিত করে দেন। এটাই হলো তাওহীদের শিক্ষা। শিরক বলা কেবল তখনই সঠিক হতে পারে যখন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের গুণাবলি ও অনুপম শানকে গায়রুল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী, আকাশ আর সুবিস্তৃত আসমানী জগতের কোথাও এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহ তায়ালার নিকট গোপন। যেসব বস্তু তার বান্দাদের কাছে গায়েব তথা দৃষ্টির বাইরে তিনি তা-ও জানেন। আবার যা প্রকাশ্য তার ইলমও তাঁর নিকটে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

"আল্লাহর নিকট আসমান ও জমিনের কোনো বিষয়ই গোপন নয়।" (সূরা: আলে ইমরান– ৫)

এ আয়াতে মুবারাকার আলোকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য কাশ্‌ফর বিশ্বাস রাখা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা ও ইলমে গায়েবকে সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার সন্দেহাতীতভাবে। যা কখনোই তাওহীদের দাবি হতে পারে না। কারণ কাশফের মধ্যে একটি গুপ্ত রহস্যকে প্রকাশিত করার অর্থ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। আম্বিয়া ও আউলিয়ার জন্য পর্দা ছিল। আল্লাহ তা উন্মোচন করে দিয়েছেন। যাবতীয় পর্দা, আবরণ দূর হওয়ার কারণে তাঁরা দূরের ও কাছের বস্তু সম্পর্কে জানেন।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির যোগ্যতার দলিল

কুরআন মাজীদে বর্ণিত উক্ত ঘটনায় সাইয়্যিদুনা সুলাইমান (আ) তাঁর দরবারের সভাসদদের কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, "বিলকীসের সিংহাসন নিয়ে এসো।" এরপর শর্তারোপ করলেন, قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ "তারা অনুগত হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার আগে।" 'সাবা'র রানি ও তাঁর সঙ্গে আরো অনেকেই হযরত সুলাইমান (আ)-এর দরবারের দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা মুসলমান হওয়ার জন্যই আসছিলেন। সুলাইমান (আ) ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁরা দরবারে পৌছার পূর্বেই যেন সিংহাসনটা এখানে নিয়ে আসা হয়।

যদি হযরত সুলাইমান (আ) গায়রুল্লাহর জন্য দূরের বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া আর তা নিয়ে আসার শক্তি ও ক্ষমতার উপর বিশ্বাস না রাখতেন তবে কখনো এ প্রকার প্রশ্ন করতেন না। বরং সভাসদরাও জবাব দিত, "হে হযরত সুলাইমান (আ), মাখলুকের দ্বারা এমন কাজ করা কিভাবে সম্ভব? আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করুন। কারণ কেবল তিনিই অলৌকিক বিষয়ের ক্ষমতা রাখেন।" কিন্তু সভাসদদের মধ্যে কারো কাছ থেকে এ ধরনের ধৃষ্টতা পূর্ণ কথা শোনা যায়নি। বরং এর উত্তরে জনৈক 'জিন' দাঁড়িয়ে বলল–

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

"জনৈক দৈত্য জিন বলল। আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।" (সূরা: আন-নামল- ৩৯)

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যে বিষয় জিনদের জন্য বৈধ তা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষদের জন্য কিভাবে শিরক হতে পারে? শিরক তো ঐসব খোদায়ী গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য গায়রুল্লাহর জন্য ব্যবহারের মাধ্যমে জন্ম নেয় যা আল্লাহ পাকের ইজ্জতের জন্যই নির্দিষ্ট। এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের গুণাবলি থাকতে পারে না।

হযরত সুলাইমান (আ) উক্ত জিনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। এরপর মানুষের মধ্য থেকে এমন এক বান্দা দাঁড়ালেন যাঁর নিকট ছিল কিতাবের

ইলম। তিনি ওলামায়ে কিরাম ও রূহানী শক্তিসম্পন্ন মানুষদের একজন ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে হযরত সুলাইমান (আ)-এর নিকট আরজ করলেন–

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي –

"আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ।" (সূরা: আন-নামল- ৪০)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে একদিকে একজন মাখলুকের (জিন) বর্ণনা আছে যার ছিল আপন শক্তি ও ক্ষমতার উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। যিনি নিজ সামর্থ্যে শত শত মাইল দূরে পড়ে থাকা সিংহাসনকে বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার আগেই হাজির করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

অপর দিকে এক আল্লাহ তায়ালার (মানুষ) শান বর্ণনা করা হচ্ছে যিনি কাজটি চোখের পলকেই শেষ করার যোগ্যতা রাখেন। তখন সাইয়্যিদুনা সুলাইমান (আ) ডাক দিলেন,

لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

"যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে স্বীয় উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল।" (সূরা: আন-নামল- ৪০)

অদৃশ্য ক্ষমতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আপত্তিকে কখনো এভাবেও তুলে ধরা হয় যে, বান্দার কাছে তার সামর্থ্যের বাইরের বস্তু চাওয়া জায়েয নয়। এমনকি ইস্তিগাসাকে হারাম প্রমাণ করার জন্য এ ধারণাও পোষণ করা হয় যে, আম্বিয়া, আউলিয়া ও সুলাহার কাছে বান্দার ক্ষমতার বাইরে বস্তু কামনা করা শিরক। এর জবাব বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। আসলে এ ধারণা ইস্তিগাসার পদ্ধতি সম্পর্কে না বুঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা কোনো মুসলমান সাহায্য প্রার্থনা করার কালে কখনো নিজেদের অন্তরে এ আকিদা রাখে না যে, মাজাযী সাহায্যকারীগণ (অর্থাৎ নবী ও অলীগণ) নিজেদের ক্ষমতায় আমাদেরকে সাহায্য করবেন। বরং

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাদের অন্তরের ইচ্ছা থাকে যে, তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের হাজত পূরণের মাধ্যম ও অসিলা হবেন। যেমন অন্ধ সাহাবীর (রা) ঘটনা ও বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনার বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। উল্লিখিত সাহাবীগণ (রা) আল্লাহ তায়ালাকে মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার মালিক) আর সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসিত গুণাবলিকে অসিলা মনে করে নিজেদের হাজত পূরণের আবেদন করেছেন। যার ফলস্বরূপ মুওয়াহ্হিদে আকবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সর্বোত্তম তাওহীদবাদী) যিনি তাওহীদ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি অবগত তিনি সাহাবীদের কিরামকে বাধা দান আর শিরক বলার পরিবর্তে তাদের জন্য দুআ করেছেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিপদ দূর করে দিয়েছেন। যদি বান্দার সামর্থ্যের বাইরের ব্যাপারে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হতো তবে–

প্রথমত সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ ধরনের আবেদন করতেন না।

দ্বিতীয়ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে এ প্রকারের শির্ক সম্পর্কে সতর্ক করে সব সময়ের জন্য এ প্রকারের আবেদনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।

তৃতীয়ত আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের সাহায্য করতে নিষেধ করতেন এবং শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করতেন। সাহাবায়ে কিরামের সাহায্য প্রার্থনা, প্রত্যুত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল্লাহ তায়ালা এ কাজে বাধা না দেওয়া এ তিনটি মিলে এটা প্রমাণ করে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু বৈধ নয় বরং সাহাবীদের (রা) সুন্নাত এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। মুজিযা কামনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যখন কাফির ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুজিযা রূপে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্যাবলি দেখতে চাইল তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কাজগুলোকে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত না করে স্বীয় পবিত্র হাতে প্রার্থীত মুজিযাসমূহ (চাঁদ বিদারণ ইত্যাদি) প্রকাশ করলেন। যদি

বান্দার জন্য দুঃসাধ্য এসব কাজ (চাওয়া ও প্রকাশ করা) শিরক হতো তবে শেষ যুগের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া কীভাবে সম্ভব ছিল? যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজ শিরক নয় (যার কল্পনা ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়) তবে সাহাবায়ে কিরামের সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে উম্মত কর্তৃক এ প্রকারের কাজ প্রার্থনা করা শিরক হবে কিভাবে?

মুসলমানরা সর্বদা নবী ও ওলীগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনার সময় এ বিশ্বাস রাখে যে, তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ ও দুআ করে আমাদের হাজত পূরণ করে দিবেন। এটাই আমাদের আকীদা। সমস্ত মুসলিম উম্মাহর আকীদা এটা।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন মাজীদে বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ

"পবিত্রতা তাঁর জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন ওই সব বস্তু থেকে, যেগুলোকে ভূমি উৎপন্ন করে।" (সূরা: ইয়াসীন– ৩৬)

কুরআন মাজীদে খোদ আল্লাহ তায়ালা মাটিকে উদ্ভিদের উৎপাদনকারী বলেছেন। তবে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার শক্তি মাটির নেই। মাটি শুধু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যম।

এ আয়াতে মুবারাকা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, অসিলা ও মাধ্যমকে কর্তা বলার মধ্যে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই। কারণ এখানে বিশুদ্ধ অর্থ নেয়ার জন্যই মাজাযী আকলী নেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এর বহু উদাহরণ আছে। এখানে হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ অর্থে মুসলমানরা যেসব বাক্য ব্যবহার করে থাকে তা শিরক থেকে এমনভাবে মুক্ত যেভাবে মুক্ত আল্লাহ তায়ালার কালামে মাজীদ ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় হাদীসসমূহ।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ ব্যতীত কোনো সাহায্যকারী নেই

কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে কারীমায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিলায়েত ও সাহায্য করার ক্ষমতা নেই বলা হয়েছে সকল আয়াতের ভিত্তিতে কারো মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করাকে হারাম বলা হয়। এমনও বলা হয় যে, বিলায়েত ও সাহায্যের মালিক কেবল আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর ক্ষমতাকে অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা শিরক।

যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাকের ইরশাদ–

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

১. অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।" (সূরা: আল-বাকারা– ১০৭)

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

২. অর্থাৎ, "তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা: আল-আহযাব– ১৭)

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

৩. অর্থাৎ, "তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত।" (সূরা: আশ-শুরা– ২৮)

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

৪. অর্থাৎ, "অবশ্য কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।" (সূরা: আল-বাকারা– ১২০)

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا

৫. অর্থাৎ, "আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট আর সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা: আন-নিসা– ৪৫)

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ

৬. অর্থাৎ, "আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না।" (সূরা: আল-আনফাল– ১০)

وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

৭. অর্থাৎ, "দান করুন আমাকে নিজের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।" (সূরা: বনী ইসরাঈল– ৮০)

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

৮. অর্থাৎ, "আপনার জন্য আমার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।" (সূরা: আল-ফুরকান– ৩১)

উপরোল্লিখিত সর্বপ্রকার আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে হাকিকি অর্থের উপর কিয়াস (অনুমান) করে এ দলিল উপস্থাপন করা হয় যে, আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাকের জন্য ولی (ওলী) نصیر (নাসীর অর্থাৎ, সাহায্যকারী) سلطان (সুলতান) ও هادی (হাদী) অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই উক্ত গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে। অন্তর্ভুক্ত করা শিরক।

অসার প্রমাণ উপস্থাপন

কুরআন মাজীদে কিছু শব্দ আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহার করার অর্থ এটা কখনো নয় যে, ঐ শব্দগুলো গায়রুল্লাহর জন্য ব্যবহার করলে শিরক হবে। এ ব্যাপারে নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

যেমন কুরআন শরীফের যেখানে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের জন্য ولی (ওলী) نصیر (নাসীর) ইত্যাদি শব্দ এসেছে সেখানে তার বান্দাদের জন্যও মাজাযী (রূপক) রূপে গণ্য হবে একই শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানে কলেবর বৃদ্ধি না করে শুধু ولی (ওলী) نصیر (নাসীর) শব্দ সংবলিত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করছি। আবার আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য অনেক সিফাতও (যেমন– سمع ، بصیر ও شهید ইত্যাদি) কুরআন মাজীদে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, "আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (সূরা: আন-নিসা- ৭৫)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

অর্থাৎ, "তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ।" (সূরা: আল-মায়িদাহ- ৫৫)

وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

অর্থাৎ, "আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ন মুমিনগণ তার সহায়।" (সূরা: আত-তাহরীম- ৪)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অন্যের সহায়ক।" (সূরা: আত-তাওবাহ- ৭১)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হলো যে, ولى (ওলী) نصير (নাসীর) এবং এ ধরনের অন্য যেসব শব্দ কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাকের সিফাত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের জন্য সে শব্দ ও সিফাত ব্যবহার করা কেবল মাজায হিসেবে বৈধ তা নয় বরং আল্লাহ তায়ালার সুন্নত (রীতি)। আল্লাহ পাকের সুন্নাতকে শিরক আখ্যাতি করা ইসলামি শিক্ষা ও দর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল। ইসলামের আহকাম কখনো এ শিক্ষা দেয় না।

প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা কেবল আল্লাহর কাছেই বৈধ

ইস্তিগাসা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে মুবারাকের মাধ্যমে একটি ভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। ঐ হাদীসে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ আছে। হাদীসে মুবারাকের শব্দগুলো নিম্নরূপ-

اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعك بشى لم ينفعك الابشى قد كتبه الله لك، ولواجتمعوا على أن يضروك بشى لم يضروك الابشى قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف -

"যখন তুমি প্রার্থনা করবে আল্লাহর নিকটেই করবে। যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রাখো! যদি সকল উম্মত মিলে তোমার উপকার করতে চায় তবুও আল্লাহর প্রদত্ত তাকদীরের বিপরীতে তা করতে পারবে না। একইভাবে যদি সকল উম্মত মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায় তখনও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না। (কেননা নিয়তির লেখার) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লেখাগুলো শুষ্ক হয়ে গেছে।" (জামিউত্ তিরমিযী, আবওয়াবুয্ যুহদি)

নিম্নে আমরা একথাটি স্পষ্ট করবো যে, হাদীসে মুবারাক থেকে যে মাসআলা উদ্ভাবন করা হয় অর্থাৎ 'কেবল আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা ও ইস্তিগাছা বৈধ, অন্য কারো কাছে কৃত প্রার্থনা ও ইস্তিগাসা শিরকে লিপ্ত করার কারণ'- কথাটি সম্পূর্ণ ভুল।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রার্থনা আল্লাহ পাকের নির্দেশ

উক্ত ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা মাধ্যম গ্রহণ করার পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়ে যায়। প্রার্থনা, ইস্তিআনাত ও ইস্তিগাসার ব্যাপারে বর্ণিত কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণ অনর্থক হয়ে গেল। এ ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুরআন অবতরণের লক্ষ্য সম্পর্কে না জানা এবং ইসলামি শিক্ষার গভীর অধ্যয়নের অভাবেই সম্ভব হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সকল মুসলিম উম্মাহর প্রতি শিরক ও কুফরের অপবাদ দেয়া। বাস্তবতা হল, এ হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা ইস্তিগাসা ও ইস্তিআনা হারাম হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়। বরং এ হাদীসের লক্ষ্য হচ্ছে, বান্দার দৃষ্টিকে মাধ্যম থেকে সরিয়ে মূল লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নিবদ্ধ করা যাতে বান্দা ইস্তিগাসার মাধ্যম বা অসিলার (মাজাযী মুস্তাগাস) কল্পনায় বিভোর হয়ে হাকিকি মুস্তাগাসকে ভুলে না যায়। এজন্য অন্যান্য ইসলামি শিক্ষার আলোকে এ হাদীসের অর্থ হবে, হে বান্দা, যখন তুমি আল্লাহর কোন মাখলূকের নিকট আবেদন, ইস্তিআনাত ও ইস্তিগাছা করবে তখন আল্লাহর সত্তা ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর পূর্ণ ভরসা রাখো, তাকেই হাকিকি মুস্তাগাস ভেবে প্রার্থনা করো। এ মাজাযী (রূপক) মাধ্যমগুলো যেন তোমাকে সমস্ত কার্যকারণ ও মাধ্যমের স্রষ্টা থেকে বিমুখ না করে। তোমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা বা আড়াল হয়ে না দাঁড়ায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে ইসলামের ইস্তিআনাত এবং সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেননি বরং বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের বিপরীতে কোন ইস্তিগাসা সম্ভব নয়। এতে আল্লাহর দরবারে অসিলা হয়ে কারো হাজত পূরণ করার অস্বীকৃতি কোথায়? আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা এবং তাঁর কথামতো কাজ করার মধ্যে আসমান-জমীনের পার্থক্য। একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? হাদীসে মুবারকের শেষোক্ত শব্দাবলি جفت الاقلام و رفعت الصحف (কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে লেখাগুলো শুকে

গেছে) এ কথাকে স্পষ্ট করছে যে, অন্যের সাহায্যে ইস্তিগাসা নিষিদ্ধ শুধু আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের বিপরীতেই।

এ হাদীসটি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রার্থনা ও ইস্তিগাসা থেকে বাধা দানের জন্য নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে চাওয়ার নির্দেশ বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, "কাজেই, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" (সূরা: আন-নাহল- ৪৩)

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় মুমিনদেরকে আহলে যিকর অর্থাৎ জ্ঞানবানদের কাছে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতে কারীমা ছাড়াও উক্ত অর্থে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসে নববীর মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয় যে, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ-এর উদ্দেশ্য ও অর্থ অন্যের নিকট প্রার্থনার শর্তহীন নিষেধাজ্ঞা নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে যেন রাজা-বাদশাহদের নিকট ধনসম্পদ, ক্ষমতাবানদের কাছে সম্মান ও পদ চাওয়া না হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছেই দয়া-অনুগ্রহ-সম্মান প্রভৃতি প্রার্থনা করা হয়। এ হাদীস থেকে অন্যের কাছে 'যাচনা' করা হারাম-এ অর্থ নেয়া কখনোই সঠিক নয়। وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ-এর মধ্যে অন্যের কাছে যাচনা করা অর্থাৎ ইস্তিগাসা ও তাওয়াস্সুল হারাম হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। বরং অসংখ্য হাদীসে এসেছে যে; সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহুবার সাহাবীদেরকে স্বয়ং প্রার্থনার উৎসাহ দেন এবং প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। (যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।)

যদি অন্যের নিকট চাওয়া শিরক হয় তাহলে ছাত্র শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করা, রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করা, অভাবী ব্যক্তি সচ্ছল মানুষের কাছে ভিক্ষা করা, কারো নিকট কোন কিছু চাওয়া, এবং কর্জগ্রহীতার কাছে কর্জ ফেরত চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক ও নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হবে।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরো কিছু চাও

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সৌভাগ্যবান সাহাবী সাইয়্যিদুনা রাবিআ ইবন কা'ব (রা) এক রাতে তাঁর পবিত্র দরবারে ছিলেন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযু করার জন্য পানি দিলেন এবং তাঁকে অযু করিয়ে দিলেন। এ খিদমতের দরুন মালিকে কওন ও মকাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হয়ে হযরত রাবিআ (রা) কে বললেন, سل অর্থাৎ 'চাও, যা তোমার যা ইচ্ছা।' এত বড় সুযোগ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্ত সাহাবী সাহিবে লাও-লাকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট চিরদিন তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবুল করলেন। হযরত রাবিআ (রা) খোদ বর্ণনা করেন:

كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لى سل فقلت أسألك مرافقتك فى الجنة قال أوغيرك قلت هو ذالك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود -

"আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে একটি রাত অতিবাহিত করেছি। (এবং শেষ রাত্রিতে) তাঁর অযু ও হাজত পূরণের উদ্দেশ্যে পানি দিয়েছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি চাও' (তোমার যা ইচ্ছা)। আমি আরজ করলাম, আমি চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবার আর কিছু? আমি আরজ করলাম, এটাই যথেষ্ট। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে বেশি বেশি সিজদা করার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।" (মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদ শরীফ)

এ হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর সাহাবীকে (রা) চাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। যদি গায়রুল্লাহর নিকট চাওয়া হারাম হতো তাহলে সবচেয়ে বড় তাওহীদবাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতেন না। হাদীসের শেষোক্ত শব্দগুলোতে তিনি নিজেই তাঁর সাহাবীর নিকট অত্যধিক সিজদার মাধ্যমে সাহায্য চেয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত রূপে সঠিক। এর বিপরীত ফতওয়া দেয়া কোনো তাওহীদবাদীর চরিত্র হতে পারে না। এ ধরনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিপূর্ণ চিন্তা-চেতনা ইসলামের বিশ্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফসল।

সাহায্য-প্রার্থনা খোদ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালার দরবারে অভাব পূরণ ও সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রিয় মাখলুক এবং তাঁর পছন্দনীয় আমল কাজের মাধ্যমে ইস্তিগাসা করা আল্লাহর নির্দেশের শামিল। এখন আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে এর কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

১. কালামে মাজীদে এসেছে–

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

অর্থাৎ, "তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে।" (সূরা: আল-বাকারা– ৪৫)

এখানে ধৈর্য ও আমল ইত্যাদি সৎ আমলগুলোর মাধ্যমে ইস্তিআনাতের নির্দেশ এসেছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। এতে মুমিনদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ধৈর্য ও নামাযের মত ভালো আমলগুলোকে অসিলা ও মাজাযী মুস্তাআন বানিয়ে হাকিকি সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

২. এ ব্যাপারে আরো একটি আয়াতে কারীমা দেখুন– যাতে যুদ্ধের জন্য হাতিয়ারের ইস্তিগাসা এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

"আর প্রস্তুত করো তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে।" (আল্ আনফাল– ৬০)

৩. তাছাড়া আল্লাহ পাকের ইজ্জতের প্রিয় ও সম্মানিত বান্দা হযরত যুলকারনাইন সম্পর্কেও কুরআন মাজীদ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি শত্রুর মোকাবিলায় স্বীয় সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কুরআনে এসেছে–

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

"অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো।" (আল কাহফ, ১৮: ৯৫)

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত সালাতুল খাওফ (ভয়ের নামায)ও মাজাযী ইস্তিগাসার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কেননা এটা শরীয়তসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মাখলুক কর্তৃক গায়রুল্লাহর কাছে ইস্তিআনা করার বিধান রয়েছে।

৫. হাদীস শরীফে সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য মুমিনদেরকে পরস্পর সাহায্য ও ইস্তিআনা করার নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ مِنْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ

"যে আপন ভাইয়ের হাজত পূরণ করে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার হাজত পূর্ণ করেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

৬. অপর একটি হাদীসে কথাটা কিছুটা ভিন্নভাবে এসেছে–

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

"আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইকে সহযোগিতা করে।" (আস্‌সহীহ লি মুসলিম, জামিউত তিরমিযী)

৭. ইমাম হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে পরস্পর সাহায্য ও হাজত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ বরকতময় আমলের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন–

لأ يمشى احدكم مع أخيه فى قضاء حاجة افضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين

"তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের সঙ্গে সাহায্যের জন্য যাওয়া আমার মসজিদে দু'মাস ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম।" (আল্ মুসতাদরাক, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

৮. আল্লাহ পাক মানুষের বিপদ ও সমস্যা দূরীকরণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য বিশেষ করে এমন একটি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন যারা দুঃখী মানুষের সেবা ও তাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। হাদীসে এসেছে–

إن للّٰهِ خلقا خلقهم لحوائج الناس تفزع الناس اليهم فى حوائجهم اولئك الآمنون من عذاب اللّٰه

"আল্লাহ তায়ালা মানুষের হাজত পূরণের জন্য একটি মাখলুক সৃষ্টি করে রেখেছেন যাতে মানুষ প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের শরণাপন্ন হতে পারে। তারা আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত।" (মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চারিত শব্দাবলি "মানুষ নিজেদের হাজত পূরণের জন্য তাদের শরণাপন্ন হয়" বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মানুষ ইস্তিআনা ও ইস্তিগাসার নিয়তে আল্লাহর উক্ত মাখলুকের শরণাপন্ন হওয়াকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম বলেছেন। দ্বীন সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞানের দরুন তাকে হারাম এমনকি শিরক বলা হচ্ছে।

৯. এ ব্যাপারে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলি এরকম–

ان للّٰه عند اقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا فى حوائجهم الناس مالم يملوا فاذا ملوا نقلها الى غيرهم

"আল্লাহ পাক বান্দাদের নিকট তাঁর নিয়ামত রেখেছেন। ঐ বান্দারা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিয়োজিত থাকেন। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন এ দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয়া হয়।" (মুজামুল আওসাত, আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মাখলুকের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা ও ইস্তিগাসার ফলে তাদের পক্ষ থেকে সাহায্য আসা আল্লাহ পাক ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছা। যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন খোদ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সকল মুসলিম উম্মাহ সর্বযুগে এ হুকুম পালনে লাব্বায়েক বলেছেন। যেটা কখনাই শিরক বিদ'আত হতে পারে না। লক্ষণীয় ব্যাপার হল উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো কেবল ইস্তিগাসার বৈধতা নয় বরং আল্লাহর নির্দেশের পর্যায়ে পড়ে।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য-প্রার্থনার নিষেধাজ্ঞা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জাহেরী জীবনে এক মুনাফিক মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার দূরভিসন্ধিতে থাকত। হজরত সিদ্দীকে আকবর (রা) সাহাবীদেরকে বললেন, আসো আমরা সকলে মিলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এ মুনাফিকের বিপক্ষে ইস্তিগাসা করি। যখন একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি বললেন–

إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِيْ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللّٰهِ -

"আমার নিকট ইস্তিগাসা করা যায় না। কেবল আল্লাহর কাছেই ইস্তিগাসা করা যায়।" (মাজমাউয্ যাওয়াইদ)

এ পবিত্র হাদীসের অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়া আর বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য না জানার কারণে কিছু লোকের ধারণা হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে ইস্তিগাসাকে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য এখন যদি কেউ গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তাহলে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

হাদীস শরীফটির প্রকৃত অর্থ

এ একটি হাদীসকে তার হাকিকি অর্থে রেখে অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও সাহাবীদের আমলের বিরোধিতা করা হয়েছে। যেসব আয়াত ও হাদীসে স্পষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে ইস্তিগাসার হুকুম পাওয়া যায় (তন্মধ্যে একটির বিশদ বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে) এ হাদীসের। হাকিকি অর্থের উপর আমল করলে উক্ত সকল আয়াত ও হাদীসকে তাকের উপর তুলে রাখা ব্যতীত উপায় নেই। ইসলামী শরীয়তের সর্বজনবিদিত মূলনীতি হল, যখন কোনো হাদীসে কুরআন মাজীদ বা অন্যান্য হাদীসে মুতাওয়াতিরের বিরোধী আহকাম পাওয়া যায় তাহলে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধানের চেষ্টা করতে হবে। আর যদি হাকিকি অর্থ গ্রহণ করলে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় তখন বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উক্ত মত বিরোধসম্পন্ন হাদীসকে মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করে স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসগুলোর সঙ্গে এর বিরোধ মীমাংসা করতে হবে। এখানেও উক্ত মূলনীতি অনুসরণীয়।

এখানে উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল মৌলিক আকীদার মাঝে তাওহীদের হাকিকত অর্থাৎ বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর তা হল হাকিকি দাতা ও সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত কেবল আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। মানুষ হচ্ছে ইস্তিগাসার মধ্যে শুধু অসিলা ও মাধ্যম।

এ হাদীসটি শুধু জীবিত লোকদের নিকট ইস্তিআনা ও ইস্তিগাসা নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ নির্দেশ করে না যেমনটি কিছু লোকের ধারণা। বরং বাহ্যিকভাবে এ হাদীসে তো জীবিত, মৃত সকল গায়রুল্লাহর নিকট ইস্তিগাসাকে সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি।

অনেক সময় আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা থেকে কিছু লোক প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে থাকে। তখন অন্যান্য স্থানে তার গ্রহণকৃত উক্ত মতের বিরোধী বক্তব্য থাকে। মুনাফিকের কষ্টদানের দরুন সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক তার বিরুদ্ধে হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইস্তিগাসাও একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি উক্ত হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না হয় তবে হাদীসের সাথে অন্যান্য আয়াত, হাদীস ও সাহাবীদের আমলের বিরোধ আবশ্যক হয়ে পড়ে। হাদীস গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা মুনাজাত করাতেন। তাঁর মহান অসিলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তাঁরা নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাধ্যমে ইস্তিগাসার ক্ষেত্রে সকল উম্মতের চেয়ে এগিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি উল্লেখ আছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তিনি আবু তালিবের লিখিত নিম্নোক্ত কবিতাটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে পাঠ করতেন। এতে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনা করলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণের আগেই বৃষ্টির পানি নালা দিয়ে প্রবাহিত হতো। কবিতাটি নিম্নরূপ:

وابيض يستسقى الغمام بوجهه : ثمال اليتامى عصمة للارامل

"উক্ত শুভ্র সুন্দর সত্তা যাঁর সমুজ্জ্বল চেহারার অসিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, যিনি ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল।" (বুখারী শরীফ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক উক্ত ভক্তি ও ভালোবাসাপূর্ণ কবিতার আবৃত্তি প্রকাশ হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক কত গভীর ছিল। যখনই তাঁদের উপর কোনো সমস্যা-বিপদ এসে যেত তাঁরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইস্তিগাসা ও ইস্তিআনার জন্য তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতেন। যখন সাহাবীদের আমলের মাধ্যমে উক্ত মতবিরোধপূর্ণ হাদীস স্পষ্ট হলো আর তা কুরআন সুন্নাহর শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও হয়ে গেল তখন এ মূর্খ বন্ধুদের ব্যাখ্যা ও ফতওয়ার মাধ্যমে কুফর ও শিরক আখ্যা দিলে তাকে কিভাবে তাওহীদের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায়? তাওহীদের কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই একথার অনুমতি দেয় না যে, কেবল একটি বিরোধপূর্ণ হাদীসের উপর আমল করে অন্য সর্বপ্রকার ইসলামি শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে সকল মুসলিম উম্মাহর উপর কুফর ও শিরকের অপবাদ দেয়া যাবে।

তৃতীয় অধ্যায় :----------

আল্লাহর ওলীগণের অসিলা গ্রহণের প্রতি উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ ও সেগুলোর জবাবাদি

১ নং প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ -

অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সাহায্যকারী। কাউকে মাধ্যম মেনে নেয়া এক ধরনের সাহায্যকারী মেনে নেয়ার ন্যায় হওয়ায় এটা শিরক।

উত্তর: এর তিনটি জবাব রয়েছে–

প্রথমত: مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ ছাড়া) দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াকে বুঝিয়েছে।

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন, তাহলে কেউ আল্লাহর মোকাবিলায় তার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই, আল্লাহর ওলীগণের অসিলা গ্রহণ করা জায়েয আর আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বীর অসিলা জায়েয নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তায়ালাই তোমাদেরকে বেইজ্জত করতে ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সাহায্য কে করতে পারবে? মুসলমানদের আল্লাহর প্রতিই তাওয়াক্কুল করা উচিত।" এ আয়াত হলো তোমাদের পেশকৃত আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়ত: এখানে "সাহায্য" দ্বারা আল্লাহর চিরস্থায়ী সাহায্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অসিলাসমূহের সাহায্য আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে হয়।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয়তঃ এ আয়াত থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, যদি তোমরা কুফরী অবলম্বন করো, তবে তোমাদের কেউ সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

অর্থাৎ জালিম বা কাফিরদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যদি এ অর্থ করা না হয়, তবে বল– এ আয়াতের কী অর্থ হবে?

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ -

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ওই সকল মুসলমান যারা নামায আদায় করে, যাকাত দেয়।

এখানে তিন সত্তাকে (আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদারকে) এ সাহায্যকারী বলা হয়েছে। আরও বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ আপসে সাহায্যকারী।

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্যের প্রমাণ আছে। তোমাদের পেশকৃত আয়াত তার অস্বীকৃতি দিচ্ছে। তাহলে এমন অর্থ করো, যদ্বারা পরস্পর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।

২ নং প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -

অর্থাৎ হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার দোয়া করুন বা না করুন, উভয় সমান। আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করবেন না।

বুঝা গেল যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া মাগফেরাতের মাধ্যম নয়। যখন তাঁর দোয়া অসিলা হচ্ছে না, তবে অন্যান্য ওলীদের প্রশ্নই ওঠে না।

উত্তরঃ এ আয়াতখানা ঐ সকল মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে অন্য পথে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে চায়। এ আয়াতের পূর্বে এভাবে বর্ণিত আছে–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ -

অর্থাৎ যখন ঐ সকল মুনাফিককে বলা হয় যে, "তোমরা এসো আল্লাহ রাসূল তোমাদের জন্য মাফ করবেন। তখন তাঁর থেকে তারা অর্থাৎ মুনাফিকগণ মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহঙ্কার করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে থেমে যায়।"

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ হে মাহবুব! যে আপনার দরবার থেকে বেপরওয়া হয়ে যাবে আর আপনি আপন অনুগ্রহে তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেও ফেলেন, তথাপি আমি তাদের ক্ষমা করব না। কেননা আমার কাম্য নয় যে, কেউ আপনার অসিলা ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করুক।

এ আয়াত দ্বারা তো অসিলাই প্রমাণিত হল, অস্বীকৃতি নয়। এ কুরআন মাজীদে মুসলমানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি মুসলমানদেরকে দোয়া করুন। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া বৃথা হতো, তবে এর নির্দেশ কেন দেয়া হলো?

জনাব, কথা হলো–

باراں کہ درلطافت طبعش خلاف نیست

درباغ لالہ روید ولاشورہ بوم خس

অর্থাৎ বৃষ্টি তো উপকারী তবে দুর্ভাগ্য। লবণাক্ত ভূমি তদ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এটা ঐ ভূমির নিজের দোষ, বৃষ্টির নয়।

৩ নং প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অর্থাৎ "এদের মধ্যে কারো আপনি জানাযার নামায আদায় করবে না এবং তাদের কারো কবরের নিকট দাঁড়াবেন না।"

এ আয়াতের শানে অবতীর্ণ হলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর লাশকে তার মুবারক জামা

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরায়েছেন, এবং তার মুখে থুতু দিয়েছেন, তার জানাযার নামায আদায় করেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ সকল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া, নামাযে জানাযা, মুবারক জামা পরানো ও মুখে থুতু মুবারক দেয়া সব বৃথা হয়েছে, কোন লাভ হয়নি।

বুঝা গেল যে, "অসিলা" কোনো জিনিস নয়।

উত্তরঃ এর জবাব এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে–

إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ -

অর্থাৎ "কারণ হলো তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের অস্বীকার করেছে আর কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করেছে, আর তারা ফাসিক।"

বুঝা যায় যে, যেহেতু সে জীবিত অবস্থায় মুনাফিক ছিল আর কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করেছে। এ কারণে তার জন্যে কোন "অসিলা" লাভ হল না। অসিলা হলো ঈমানদারগণের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়। ওষধসমূহ রোগাক্রান্তদের জন্য উপকারী, মৃতের জন্য নয়। গুনাহগার মুমিন হলো রোগী এবং কাফির ও মুনাফিক হলো মৃত।

৪ নং প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর কাছে অসিলা তালাশ করো, আর তাঁর পথে জিহাদ করো, যেন তোমরা সাফল্য অর্থাৎ বেহেশত পাও।"

আয়াতে "অসিলা" আমলসমূহের অসিলাকে বুঝানো হয়েছে, বুজুর্গদের অসিলা নয়। কারণ, যারা বুজুর্গদের অসিলা গ্রহণ করছে তারাতো নিজেরা আমলসমূহ করতেন।

উত্তরঃ এর কয়েকটি জবাব আছে– প্রথমতঃ আমলসমূহ তো اِتَّقُوا اللّٰهَ-এর মধ্যে এসে গেছে। যদি 'অসিলা' দ্বারাও আমলসমূহকে বুঝায়, তবে আয়াতে একটা বিষয়ের পুনঃ উল্লেখ হবে। কাজেই, এখানে "অসিলা" দ্বারা বুজুর্গদের অসিলাকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি আমলের "অসিলাকে" বুঝায়, তবে মুসলমানদের শিশু সন্তান, পাগল মুসলমান এবং ঐ নও মুসলিম যারা মুসলমান হওয়া মাত্রই মরে গেছে, এদের নিকট তো আমলসমূহ নেই তারা কার অসিলা গ্রহণ করবে?

তৃতীয়তঃ যদি আমলসমূহের অসিলাকে বুঝায়, তবে শয়তানের কাছে অসংখ্য আমল ছিল। এসব আমল ওর জন্য "অসিলা" হলো না কেন?

চতুর্থতঃ যদি অসিলা দ্বারা আমলসমূহকেই বুঝায়, তবে আমলসমূহও নবী-ওলীর মাধ্যমে অর্জিত হয়। তখন ঐ সম্মানিত সত্তাগণ আমলসমূহের অসিলা হয়ে গেলেন আর অসিলার অসিলা নিজে অসিলা হয়ে থাকে। বরং প্রকৃত কথা এ যে আমাদের আমলসমূহ হল বুজুর্গদের অনুসরণ। রমী (অর্থাৎ হজ্জে পাথর নিক্ষেপ করা) হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর অনুকরণ, 'সাফা' 'মারওয়া' এর মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো হযরত হাজেরা (রাদি আল্লাহু আনহা)-এর অনুসরণ, কুরবানী করা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর অনুকরণ, তাওয়াফ করার সময় বাহু হেলায়ে বুক ফুলায়ে চলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ। এ জন্য ঐ সব কাজের সাওয়াব লাভ হয় যে, এগুলো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুকরণ। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বেহেশত অনেক খালি থেকে যাবে। তখন তা পূর্ণ করার জন্য একদল সৃষ্টি করা হবে। বলুন ওই দল কোন্ প্রকার আমলসমূহ করেছে?

নোট : জান্নাতে প্রবেশ তিনভাবে হবে:

১. কাসাবী
২. ওয়াহাবী
৩. আতায়ী।

কাসাবী হলো যার মাঝে জান্নাতী ব্যক্তির আমলের দখল থাকবে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

জান্নাত তাদের আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান।

জান্নাতে ওয়াহাবী, যা কোনো বান্দার অসিলায় লাভ হবে। স্বীয় আমলের দখল থাকবে না। যথা: মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুগণ আর পাগল মুসলমানগণ জান্নাতি, তবে আমলসমূহ ছাড়া। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِاِيْمَانٍ -

জান্নাতে আতায়ী যা কেবল আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে অর্জিত হয়েছে, অন্য কোনো জিনিসের দখল হবে না। যেমন জান্নাত পূর্ণ করার জন্য যাদের সৃষ্টি করা হবে। অথবা যারা শাফায়াত ব্যতীত জান্নাতে যাবে যাদেরকে জাহান্নামী বলা হবে, যাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে–

আল্লাহ পাক নিজের একখানা কুদরাতের ওষ্ঠ জাহান্নামী লোকদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এবং ঐ সকল লোকের "ঈমানে শরয়ী" বা শরীয়তসম্মত ঈমান ছিল না। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিলা সবার প্রয়োজন।

মোট কথা আমল ব্যতীত বেহেশত অর্জিত হতে পারে কিন্তু অসিলা ছাড়া বেহেশত কখনো অর্জিত হতে পারে না।

৫ নং প্রশ্ন: কুরআনে কারীম ঘোষণা করছে :

যখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজ পুত্র "কেন্‌আন"-এর জন্য সুপারিশ করেছেন, তখন তাঁকে বলা হয়েছে–

يَانُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ -

অর্থাৎ "হে নূহ আলাইহিস সালাম নিশ্চয় সে (কেন্‌আন) আপনার পরিবারের নয়, তার আমলসমূহ খারাপ।"

বুঝা গেল যে, আমল খারাপ হওয়া অবস্থায় নবী ওলীর মাধ্যম হয় না।

উত্তর: হ্যাঁ জনাব! ঐ কেন্‌আনের আমল অসৎ ছিল। সে নবীর অসিলার অস্বীকারকারী ছিল। তুফান আসলে সে তাঁর (নূহ) আশ্রয়ে আসেনি। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন–

يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস, আমাদের সঙ্গে সওয়াব হয়ে যাও। কাফিরদের সঙ্গে থাকো না। তখন সে জবাব দিয়েছিল–

قَالَ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ -

অর্থাৎ "আমি পাহাড়ে আশ্রয় নেব। তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।" এ কারণে সে ডুবে গিয়েছিল। এখন যারা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) অসিলাকে অস্বীকার করছে তারা এর থেকে উপদেশ নিতে পারে।

এ আয়াতে তো অসিলার প্রমাণ আছে, অস্বীকৃতি নয়। যদি (কেন্‌আন) হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর অসিলা গ্রহণ করত, তবে কখনো ডুবত না।

৬ নং প্রশ্ন: হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর কওমের জন্য দোয়া করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছে–

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ -

অর্থাৎ হে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আপনি দোয়া করুন বা না করুন এদের উপর শাস্তি আসবেই।

দেখুন নবীর দোয়া কবুল হয়নি।

উত্তর: 'লুত গোত্র' কাফির ছিল। কাফিরদের জন্য কোনো মাধ্যম উপকারী নয়। কারণ, তারা নবীর অসিলাকে অস্বীকার করে। কোরআনে কারীম ঘোষণা করছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অসন্তুষ্ট হয়ে সামেরীকে বলেছিলেন–

اِذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ -

হযরত কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র মুখে উচ্চারিত উক্তি এমন সঠিক হয়েছে যে, তার (সামেরীর) শরীরে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, যে তাকে স্পর্শ করত, তার জ্বর হত, এবং স্বয়ং সামেরীরও। এটা খোদা তায়ালার প্রিয়দের যবানের শান।

জরুরী নোট : হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর দোয়া অবশ্যই কবুল হত। তবে তাঁদের (নবীদের) ঐ সকল দোয়া, যার বিপক্ষে আল্লাহ পাকের ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। যদি নবী এমন বিষয়ের জন্য দোয়া করেন তখন তাদেরকে বুঝিয়ে বাধা দেয়া হয়। এ বাধা প্রদানে আছে তাঁদের মহান শানের বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ হে প্রিয়, এ কাজ হতে পারে না। কাজেই, আপনি এ সম্পর্কে দোয়াই করবেন না। সোবহানাল্লাহ! প্রশ্নকারী যে 'সকল দোয়া পেশ করেছে, সব এ প্রকারের। এও স্মরণ রাখা চাই যে, ঐসব দোয়ার পেছনে নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) সাওয়াব অর্জিত

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়। কারণ দোয়া প্রার্থনা করাও ইবাদত যদিও কবুল না হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ -

অর্থাৎ আপনার দোয়া করা ও না করা উভয়ই ঐ মুনাফিকদের জন্য সমান। কেননা তাদের ক্ষমা হতে পারে না। এখানে عَلَيْهِمْ (আলায়হিম) বলেছেন। عَلَيْكَ (আলায়কা) বলেননি। عَلَيْكَ (আলায়কা) না বলায় এ কথা প্রমাণ হলো যে, নবীর দোয়া কবুল না হলেও একেবারে বিফলে যাবে না, অন্তত পক্ষে নবী নিজে সাওয়াব পাবেন।

৭ নং প্রশ্ন: মিশ্‌কাত শরীফ "বাবুল আতদার" এ বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহা)-কে বলেন–

لَا اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -

অর্থাৎ আমি আল্লাহর আযাবকে তোমার থেকে দূরীভূত করতে সক্ষম হব না। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মেয়ের জন্য অসিলা নন, তবে আমাদের জন্য অসিলা হতে পারে না। আর যখন হুজুরই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসিলা হচ্ছেন না, তখন অন্যান্য ওলীদের উল্লেখই-বা কি?

উত্তর: এর দু'টি উত্তর রয়েছে প্রথমত এ যে, রাব্বুল আলামীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আমি তোমার থেকে আল্লাহর শাস্তি দূরীভূত করতে পারব না। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি আযাব দেয়ার ইচ্ছে করেন, তবে কে আছে তা প্রতিরোধ করার? এ অসিলা তো আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে, তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নয়।

দ্বিতীয়ত হে ফাতেমা! যদি তুমি ঈমান গ্রহণ না করো, তবে আমি তোমার থেকে আল্লাহর আযাব প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব না। অর্থাৎ অসিলা ঈমানদারগণের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর পুত্র নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংস হয়ে গেছে কুফরীর কারণে। যদি এ জবাব মেনে নেয়া না হয়, তবে এ হাদিস কোরআনে কারীম-এরও বিরোধী হয়ে যাবে এবং অন্যান্য হাদিসসমূহেরও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

www.AmarIslam.com

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানগণ।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন–

كُلُّ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا نَسَبِىْ وَسَبَبِىْ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকল অসিলা ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আমার অসিলা ও আমার বংশীয় সম্পর্ক ছাড়া। (ফতওয়া-এ শামী মৃতের গোসলের অধ্যায়) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন–

شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ -

অর্থাৎ আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য। এটা কিভাবে সম্ভব যে কবীরা গুনাহগারগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে আর কলিজার টুকরা নয়নের মণি কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না। (ফত্ওয়া এ শামী)

জরুরী নোট: হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় কোনো কোনো উপকার কাফিরগণও অর্জন করে নেয়। যথা আল্লাহর কহর থেকে নিরাপত্তা, কিয়ামত দিবসে হাশর ময়দান থেকে মুক্তি আর হিসাব কিতাব আরম্ভ হওয়া এ হিসেবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপাধি হলো "রাহমাতুল্লীল আলামীন।"

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মুসলমানদের উপর অতিশয় মেহেরবান। কোনো না কোনো উপকার এমন রয়েছে যেগুলো শুধু পরহেযগারগণ পেয়ে থাকেন, গুনাহগারগণ নয়। যেমন আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভ এ অর্থের দিক দিয়ে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সুন্নাত ত্যাগকারী আমার শাফায়াত থেকে বঞ্চিত, অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা অর্জন করার শাফায়াত। কোনো কোনো কল্যাণ এমন রয়েছে যেগুলো শুধু পাপীদের অর্জন হয়, পুণ্যবানদের নয়। যেমন– পাপের ক্ষমা। কেননা পুণ্যবানদের পুণ্যই রয়েছে গুনাহ থাকে না। এ প্রকার মুসলমানদেরকে "মাহফুয" তথা রক্ষিত বলে। আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাম মাসুম বা নিষ্পাপ অর্থাৎ তাঁরা গুনাহ করতে পারে না।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাস ওলীগণ গুনাহ থেকে "মাহফুয" বা রক্ষিত অর্থাৎ তাঁরা গুনাহ করেন না। আল্লামা রুমী বলেন–

لوح محفوظ است پیش اولیا
ازچه محفوظ اند محفوظ از خطا

অর্থাৎ "লওহে মাহ্ফুয" আউলিয়া কেরাম (রহমাতুল্লাহে আলাইহুম) এর সামনে। এ কারণে তারা ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষিত। তাঁদের জন্য "গুনাহ ক্ষমা" হওয়ার সুপারিশ নেই। তাঁদের জন্য বলা হয়েছে যে,

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِیْ -

অর্থাৎ "আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।"

হে প্রশ্নকারীগণ! তোমাদের পেশকৃত হাদিসে দ্বিতীয় ধরনের "উপকারসমূহ বুঝানো হয়েছে তা এ শর্তে যে ঈমান কবুল হবে না। এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে হযরত ফাতেমা যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহা)-কে বলা হয়েছে আর অন্যান্যদেরকে শুনানো হয়েছে। অন্যথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় আবু লাহাবের "আযাব" সহজ হয়েছে, আবু তালেব দোযখে যাওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে।

৮ নং প্রশ্ন: বুখারী শরীফ কিতাবুল এস্তেসক্বা "বাবু সাওয়ালিন্নাসুল ইমামল ইস্তেসক্বা" এ বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) দুর্ভিক্ষের কালে হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং আরয করতেন–

اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْ -

অর্থাৎ হে মাবুদ! আমরা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম তখন বৃষ্টি প্রেরণ করা হতো। আর এখন তাঁর চাচার অসিলায় বারিধারা চাইছি– "বৃষ্টি প্রেরণ করুন।" অতঃপর বৃষ্টি আসত।

বুঝা গেল যে, বেসালপ্রাপ্ত বুযুর্গদের অসিলা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। জীবিতদের অসিলা গ্রহণ করা বৈধ। দেখুন হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাধা হওয়ার পর হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর অসিলা দিয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিলা ছেড়ে দিয়েছেন।

উত্তর: এর দু'টি জবাব আছে– প্রথমত: এল্যামী উত্তর হলো, যদি বেসালপ্রাপ্ত বুযুর্গদের অসিলা গ্রহণ নিষিদ্ধ হতো, তবে উচিত হতো যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেসাল শরীফের পর "কালেমা শরীফ" থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নাম আলাদা করে দেয়া, শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"কে অবশিষ্ট রাখা এবং "আত্যাহ্ইয়াত" এর মাঝে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয়া বন্ধ করে দেয়া আর "দরুদ শরীফ" বন্ধ করে দেয়া। কেননা এসব হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিলাই তো বটে। অথচ এসব কাজ অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

বুঝা গেল হুজুর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিলা বেসালের পরও একই ধরনের হয়। আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী আমলে সাহাবা কেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মুবারক ও জামা মুবারক ধুয়ে রোগীদেরকে পান করাত আর সুস্থ হয়ে যেত। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদি আল্লাহু আনহা) বৃষ্টির জন্য রওযা শরীফের ছাদ খুলে দিয়েছিলেন। যখনই কবর শরীফের সোজা উপর খুলে দেয়া হয়েছিল অমনিই বৃষ্টি এসেছিল। কুরআনে তায়ালা ঘোষণা করছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বেকার উম্মতগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নামের অসিলা নিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতো–

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

কুরআন শরীফ ঘোষণা করছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর পরবর্তীকালে তাঁর জুতা মুবারক ও টুপি মুবারক-এর অসিলায় বিজয় লাভ হতো।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فِيْهِ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ -

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ বেসালের পর মুসলমানদের সাহায্য করেছেন, তিনি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে পাঁচ ওয়াক্ত করিয়েছেন। বলুন এটা বেসাল প্রাপ্তবুযুর্গদের অসিলা কি না? আবার যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জন্মের পূর্বে তাঁর মুবারক নাম এর অসিলায় দোয়াসমূহ কবুল হতো তাহলে কি এখন তার নাম মুবারকের প্রভাব বদলে গেছে?

দ্বিতীয়ত তাহকীক উত্তর এ যে, হযরত ফারুক এ আযম (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর এ উক্তি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিলায় তাঁর ওলীগণের অসিলাও জায়েয অর্থাৎ অসিলা নবীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। হযরত আব্বাস নবী ছিলেন না, ওলী ছিলেন। আবার তাও বুঝা গেল যে, যর সম্পর্ক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে হবে, তাঁর অসিলা গ্রহণ করাও জায়েয, কারণ, হজরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন–

وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا -

অর্থাৎ আমরা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম কস্তলানী (রহমাতুল্লাহে আলাইহি) শরহে বুখারীতে বলেন–

اَىْ بِوَسِيْلَةِ الرَّحِمِ الَّتِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর অসিলায় এজন্য দোয়া করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশীয় নিকটতম সম্পর্ক ছিল (চাচাতো ভাই)।

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহে আলাইহি) এ হাদীস থেকে "ওলীগণের অসিলা" প্রমাণ করেছেন, যেমন তিনি "শরহে হিস্নে হাসীন" নামক "কিতাবে আদাবুদ্দায়া ও অসিলায়ে আওলীয়া"-এর রেওয়ায়েতে বলেন–

القصة استسقاء عمر ابن الخطاب بعباس ابن عبد المطلب ازين باب است -

অর্থাৎ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আব্বাস-এর অসিলায় বৃষ্টি চাওয়া "অসিলায়ে আউলিয়া"-এর অন্তর্ভুক্ত। এ "হিস্নে হাসীন"-এর ব্যাখ্যা সংবলিত "আলহিরযুল ওয়াসেলীনে" এ বর্ণনায় আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন–

وَهُوَ مِنَ الْمَنْدُوْبَاتِ وَفِىْ صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ حَدِيْثُ عُمَرَ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ وَلِحَدِيْثِ عُثْمَانَ اِبْنِ حَنِيْفٍ فِىْ شَانِ الْاَعْمٰى -

অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে আম্বিয়া কেরাম ও ওলীগণের অসিলা গ্রহণ করা যে "মুস্তাহাব", বুখারী শরীফের এ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর অসিলায় দোয়া করেছেন এবং হযরত ওসমান ইবনে হানিফের হাদিসে অন্ধের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

হ্যাঁ, যদি ফারুক এ আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) একথা বলতেন যে, মওলা! এ পর্যন্ত তো আমরা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসিলায় দোয়া করতাম। এখন তার ওফাতের পর তাঁর অসিলা ছেড়ে দিয়েছি। এখন হযরত আব্বাসের অসিলায় দোয়া করছি, তখন তোমাদের দলিল ঠিক হতো তবে এ রকম অস্বীকৃতির উল্লেখ নেই। কাজেই তোমাদের দলিল ভুল। আর আম্বিয়া ও আউলিয়ার অসিলা শুদ্ধ।

৯ নং প্রশ্ন: বুখারী শরীফে "হাদিসে গার" এ বর্ণিত হয়েছে যে, তিন ব্যক্তি জঙ্গলে যাচ্ছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসলে তারা আশ্রয় গ্রহণের জন্য পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। একটি বৃহৎ পাথর গুহার মুখে এসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ঐ লোকেরা নিজেদের পুণ্য কাজসমূহের অসিলা নিয়ে মুনাজাত করল। এরূপ সংকটময় মুহূর্তে কোন পীরের অসিলা তারা গ্রহণ করেনি। বরং নিজেদের পুণ্য আমলসমূহের অসিলা গ্রহণ করেছে।

বুঝা যায় যে, কোন বান্দার অসিলা গ্রহণ করা ঠিক নয়।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তরঃ এ হাদিস শরীফ শুধু একথা বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকেরা সৎ আমলসমূহের অসিলায় দোয়া করেছে। এটা কোথায় রয়েছে যে, বুযুর্গদের অসিলা নাজায়েয? দাবি হলো একটা আর দলিল হলো অন্য এক বস্তু। আমলসমূহের অসিলা গ্রহণ করাও বৈধ এবং বুযুর্গদের অসিলাও জায়েয। একটা জায়েযের উপর আমল করার দরুন অন্য একটা জায়েয কাজ কিভাবে হারাম হয়ে গেল?

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নমরুদের আগুনে যাবার কালে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর আরয করা হলেও এ বিপদ দূরীভূত হবার জন্য দোয়া করেননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম হুসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন। তবে এটা দূরীভূত করার জন্য দোয়া করেননি। তখন কি এ দ্বারা এ কথা বলা যাবে যে, দোয়া প্রার্থনা করাই হারাম। এ প্রশ্ন খুবই অমূলক।

১০ নং প্রশ্নঃ বর্তমান ওহাবী ও বদ-মাজহাবীগণ একথা বলে যে, মানুষ সে যত বড় বুজুর্গ হোক, মৃত্যুর পর এ জগত থেকে উদাসীন হয়ে যায়। এখানকার ব্যাপারে তাদের কাছে মোটেই খবর থাকে না। দেখুন 'আসহাবে কাহাফ তিনশ বছর যাবৎ নিদ্রিত থাকার পর যখন জেগেছিল তখন তারা ভেবেছিল যে আমরা একদিন ঘুমিয়েছি।

হযরত ওযাইর আলাইহিস সালামকে এক শ' বছর ধরে ওফাতপ্রাপ্ত থেকে যখন তাঁকে জীবিত করা হলো তখন আল্লাহ তায়ালা জানতে চান– كَمْ لَبِثْتَ আপনি এখানে কতদিন অবস্থান করেছেন?

তিনি বলেন–

لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ -

আমি একদিন বা তার চেয়েও কম অবস্থান করেছি। তখন তাকে বলা হলো–

لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ আপনি এখানে এক শ' বছর অবস্থান করেছেন।

যদি তাঁর দৃষ্টি এ পৃথিবীর প্রতি হতো তবে এ সময়ের অনুমানে কেন ভুল করলেন। যখন এত বড় বুজুর্গদের ইহজগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, সেখানে অন্যান্য আল্লাহর ওলীদের উল্লেখই বা কি? যখন এরা এ জগৎ থেকে এভাবে সম্পর্কহীন, তাহলে তাদের কবরসমূহের কাছে গিয়ে তাদের অসিলায় দোয়া করা বা তাদের নিকট হাজত প্রার্থনা করা একেবারে বৃথা।

www.AmarIslam.com

জবাবঃ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাগণ বেসালের পর এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন, এখানকার খবর রাখেন। মেরাজ শরীফের রজনীতে সকল নবীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়েছেন। বিদায় হজ্জের সময় অনেক নবী আলাইহিস সালাম যোগদান করেছেন। যার সংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মেরাজ শরীফের রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে পাঁচ ওয়াক্তে করিয়েছেন। যদি ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তিগণ পরজগতে গিয়ে ইহজগৎ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যান, তাহলে তবে নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেরাজ ও বিদায় হজ্জের খবর কিভাবে হলো আর হযরত মূসার আলাইহিস সালাম নামায কমানোর কী দরকার পড়েছিল?

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ -

অর্থাৎ হে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার পূর্ববর্তী নবীদের জিজ্ঞাসা করুন আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ সৃষ্টি করেছি?

যদি ঐ সব নবী আলাইহিস সালাম ইহজগৎ সম্পর্কে খবর না রাখেন তবে আবার জিজ্ঞাসা কিসের?

–মৃত ব্যক্তি কবরস্থানে আগমনকারীর পায়ের আওয়াজ শুনে থাকে। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّهٗ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ -

আসহাবে কাহাফ ও হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম-এর মোজেযা ও কারামত দেখানোর মাকসাদ ছিল। এ কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ করে ইহজগৎ থেকে সম্পর্কচ্যুত করে দিয়েছেন। যদি আসহাবে

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরাফের নিকট নিজেদের নিদ্রিত অবস্থার সময় জানা থাকত তবে বাজারে আসত না এবং কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিকট প্রকাশ হতো না। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "আমার অন্তর জাগ্রত থাকে। কেবল চক্ষু ঘুমিয়ে পড়ে।" কিন্তু "তারীসের" রাতে আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছেন এবং এদিকে নামায কাযা হয়ে গেছে, যাতে উম্মত নামায পড়ার নিয়ম জানতে পারে।

যদি নবী ওলী বেসালের পর ইহজগৎ থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় তবে আমাদের দরূদ ও সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছে? আরো মৃতদের নিকট সাওয়াব কিভাবে পৌঁছে? এমন ব্যক্তিকে সালাম করা নিষিদ্ধ যে জবাব দিতে অক্ষম। যেমন নিদ্রিত, পেশাবকারী, নামাযরত এবং আযানরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতেই পান না আর জবাব দিতে অক্ষম হন, তবে তাকে সালাম করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

এটাও হতে পারে যে, হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম-এর উপর আসলে এক শ' বছর সমতুল্য একদিন অতিবাহিত হয়েছে। যথা কেয়ামতের দিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কিন্তু ঈমানদারের জন্য এক ওয়াক্ত নামাজের সমতুল্য হবে। এ ঘটনায় উভয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল যে ওযাইর আলাইহিস সালাম-এর গাধার উপর এক হাজার বছর কেটেছিল এবং অনুমানের উপর একদিন অতিক্রান্ত হয়েছে বলাও শুদ্ধ। এটা এক হিসেবে ছিল এবং আল্লাহ পাক এটাকে এক শ' বছর বলাও সঠিক ছিল। কারণ এটা হাকীকত বা প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে ছিল।

১১ নং প্রশ্ন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু চেষ্টা করেছেন যেন আবু তালেব ঈমান গ্রহণ করেন কিন্তু ঈমান আনেনি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু করতে সক্ষম হননি বরং আয়াত অবতীর্ণ হলো–

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ -

অর্থাৎ হে মাহবুব! যাকে আপনি ভালোবাসেন তাকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। যখন তিনি আপন প্রিয়জনদের জন্য অসিলা হতে পারছেন না সেখানে অন্যান্যদের প্রশ্নই-বা কি?

উত্তর: এ আয়াতের সারমর্ম সুস্পষ্ট যে, যাকে আপনি ভালোবাসেন তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না, কারণ আপনি তো রাহমাতুল্লিল আলামীন" আপনি তো প্রত্যেক মানুষকে ভালোবাসেন, সবার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন-কাফের হোক বা মুমিন হোক, অকৃত্রিম হোক অথবা মুনাফিক হোক। কিন্তু তবে হেদায়ত ঐ ব্যক্তি পাবে যে আপনাকে ভালোবাসে আর যে আপনার প্রতি ভালোবাসা রাখবে, যে আপনার আদেশ মানবে। আবু তালেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসেনি, তাঁর কথা মানেনি এবং কালেমা পড়েনি। এ কারণে হেদায়ত পেতে সক্ষম হয়নি। এটা তার নিজের দোষ। যদি কেউ কোন দুর্দশার দরুন সূর্যের আলো না পায় তাহলে এটা তার ভাগ্যের পরিহাস, সূর্য আলো প্রদানে সংকীর্ণতা করে না। এরপরও আবু তালেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেবা করার প্রতিফল লাভ করেছে যে তাকে জাহান্নামে রাখা হয়নি বরং আগুনের শিখার উপর রাখা হয়েছে যেমন বুখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে।

১২ নং প্রশ্ন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম হুসাইনের কোনো ধরনের সাহায্য করেননি, অন্যান্যদের সাহায্য করতেও অক্ষম। কাজেই তিনি অসিলা হবেন কিভাবে?

উত্তর: হযরত ইমাম হুসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেনি যেন সবর বা ধৈর্যধারণে কোনো ধরনের ত্রুটি না আসে। যেমন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কালে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেননি। এভাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)-এর অটলতা যে এত কঠিন মুসিবতসমূহে অটল আছেন এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্যে পেয়েছেন।

১৩ নং প্রশ্ন: কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আম্বীয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) নিজেদের জীবদ্দশায়ও দুনিয়া থেকে বে-খবর থাকতেন। দেখুন– হযরত সোলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) 'হুদহুদ'

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(পাখি)-কে হারিয়ে মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন হুদহুদকে আমি দেখছি না। যদি তিনি অবগত থাকতেন তবে জিজ্ঞাসা করলেন কেন? এবং 'হুদহুদ' এসে বলল যে, আমি ঐ জিনিস দেখে এসেছি যা আপনি দেখেননি। অর্থাৎ বিলকিস ও তাঁর সিংহাসন। দেখুন– হুদহুদ পাখি সংবাদ দেয়ার আগে তাঁর নিকট না বিলকিসের খবর ছিল, না 'সাবা' শহর সম্পর্কে। যখন তিনি কোনো কিছুর খবরই রাখতেন না, তখন অসিলা হবেন কিভাবে?

উত্তর: এ আয়াতে এ কথা কোথায় রয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। হুদহুদ তাঁর নিকট এ সংবাদ ছিল না বলেও দাবি করেনি। বরং আরয করেছে–

اِنِّیْ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ "আমি এ জিনিস ব্যাপ্ত করে দেখে এসেছি যা আপনি গিয়ে দেখে আসেননি।" এবং আসলেই তিনি ঐ সময় পর্যন্ত ঐখানে সশরীরে তশরীফ নেননি। তাঁর কাছে এর খবর তো ছিল, কিন্তু প্রকাশ ছিল না, যাতে একথা জানা যায় যে, পয়গম্বরের সংস্পর্শে অবস্থানকারী জীবও হাজার হাজার মানুষের ঈমানের মাধ্যম হতে পারে। দেখুন হুদহুদ পাখিরই অসিলায় সকল ইয়ামানবাসী, বিলকিস ও অন্যান্যদের ঈমান নসীব হয়েছে। আরও হাজার হাজার হেকমত এতে নিহিত রয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আলাইহিমুস সালাম) বাদশাহ হয়েও তার সম্মানিত পিতার কাছে নিজের খবর প্রেরণ করেননি, এ জন্য নয় যে, তিনি তাঁদের থেকে বে-খবর ছিলেন। বরং সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন আর তাঁর অসাধারণ মহানত্ব প্রকাশিত হবার ছিল যে, দুর্ভিক্ষের যুগে পুরো জগতের জীবিকা তাঁর নিকট পৌঁছেছে এবং সকল মানুষকে জীবিকার ক্ষেত্রে তার মুখাপেক্ষী করে দেয়া হয়েছে।

আচ্ছা বলুন যখন হযরত সুলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) আসিফকে সিংহাসন নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন সে না কারো কাছে ইয়ামান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, না বিলকিসের ঘর কোথায় তা প্রশ্ন করছে, না সিংহাসন এর স্থান খোঁজ করেছে। বরং চক্ষের পলক মারার

আগে সিংহাসন নিয়ে উপস্থিত করে দিয়েছেন। তাঁরও বিলকিসের সকল স্থানে খবর ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে জ্বিনের সংস্পর্শে থেকে আসেফ এ ক্ষমতা লাভ করেছিল আর হযরত সুলায়মান (আলাইহিমুস সালাম) যে বে-খবর হবেন এটা অসম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَقَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ ـ

অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল:

اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ـ

অর্থাৎ আমি বিলকিসের সিংহাসন আপনি চক্ষের পলক মারার আগে নিয়ে আসব।

বলুন কিতাব আসেফ কার কাছে পড়েছিল? আশ্চর্য! শিষ্যের নিকট খবর রয়েছে, ওস্তাদের নিকট নেই। আল্লাহ তায়ালা বুঝ দান করুক। মোট কথা হযরত সুলাইমান (আলাইহিমুস সালাম)-এর কাছে ঐ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। কিন্তু যথাসময়ের পূর্বে প্রকাশ পায়নি। অসিলা তালাশ করা উদ্দেশ্যাবলি লাভ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট এটা অন্য জিনিস।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে ডাকা বা 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' শীর্ষক শ্লোগান প্রসঙ্গ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দূর বা নিকট থেকে আহ্বান করা বৈধ-তাঁর পবিত্র ইহ-লৌকিক জীবনে ও তাঁর বেসালের পরেও। তাই একজন 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্" বলে আহ্বান করুক, অথবা এক দলের সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্ বলে শ্লোগান দিক-এর উভয় ক্ষেত্রে এ আহবান জায়েজ।

'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে ডাকার দলিল

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আহ্বান করার ব্যাপারে প্রমাণাদি কুরআন করীম, ফিরিশতা ও সাহাবীদের কর্মকাণ্ড ও উম্মতের বিবিধ কার্যাবলীতে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। কুরআন করীমের অনেক জায়গায় রয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ -

হে নবী! হে রাসূল! ওহে কম্বলাবৃত বন্ধু, ওহে চাদরবৃত বন্ধু ইত্যাদি বলে। দেখা যায়, উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। অন্যান্য নবীদেরকে অবশ্য নাম ধরেই সম্বোধন করেছে কুরআন মাজীদ। যেমন–

يايحيى يابراهيم يادم ياموسى ياعيسى -

হে মূসা, হে ঈসা, হে ইয়াহয়া, হে ইবরাহীম, হে আদম ইত্যাদি (আ)। তবে মাহবুব (আ)-কে আহ্বান করেছে প্রিয় উপাধিসমূহ ভূষিত করে।

কবির ভাষায়–

يا ادم است باپدر انبياء خطاب
يا اها النبى خطاب محمد است

অর্থাৎ, নবীগণের জনক হজরত আদম (আ)-কে ডাকা হয়েছে 'ইয়া আদামু' বলে, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হয়েছে 'ওহে নবী' থাকবে।

কুরআন করীম বরং সাধারণ মুসলমানদেরও এভাবে আহ্বান করেছে يايها الذين امنوا (হে ঈমানদারগণ)। আর তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছে মাহবুব (আ)-কে আহ্বান করো সম্মানসূচক উপাধিসমূহের দ্বারা। কুরআনই ইরশাদ করেছে–

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ -

তোমরা রাসূলকে এমনভাবে ডেকো না, যেভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাকো। (সূরা: আন-নূর– ৬৩)

এখানে তাঁকে ডাকতে নিষেধ করা হয়নি। বরং অন্যান্যদেরকে ডাকার ন্যায় না ডাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন অন্যত্র এসেছে– ادعوا هم لابائهم তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে ডাক। এ আয়াতে এ কথাটির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে, যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-কে 'ইবনে হারিসা' অর্থাৎ, 'হারিসার পুত্র' বলে ডাকে, কিন্তু তাঁকে 'ইবনে রাসূলুল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহ্ পুত্র' বলে ডেকো না। এরূপ কাফিরদেরকেও অনুমতি প্রদান হয়েছে তাদের সাহায্যার্থে তাদের সাহায্যকারীদেরকে ডাকার–

وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صدقين -

অর্থাৎ, তোমরা যদি নিজের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীদেরকে ডেকো।

'মিশকাত' শরীফের প্রথম হাদীসে এসেছে, হজরত জিবরাঈল (আ) আরয করছিলেন, يامحمد اخبرنى عن الاسلام 'হে মুহাম্মদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানিয়ে দিন।' এখানে আহবান করার বিধান পাওয়া গেল। সে একই মিশকাত শরীফের 'ওফাতুন্নবী' শীর্ষক অধ্যায়ে এসেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেসালের সময় মালাকুল মউত আরয করছিলেন–

يامحمد ان الله ارسلنى اليك -

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। দেখুন, এখানেও 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে আহ্বান করা হয়েছে। 'ইবনে মাজাহ' শরীফের 'সালাতুল হাজত' শীর্ষক

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায়ে হজরত উসমান ইবন হানীফ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এক অন্ধ ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে অন্ধত্ব দূরীকরণার্থে দোয়াপ্রার্থী হয়েছিলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শিখিয়ে দিলেন এ দুআটি–

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة يا محمد انى قد توجهت بك الى ربى فى حاجتى هٰذه لتقضى اللهم فشفعه فى ـ

'হে আল্লাহ, আমি তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারফত তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার মাধ্যমে আপন প্রভুর দিকে আমার ও উদ্দেশ্যে (অন্ধত্ব মোচন) পূরণ করার নিমিত্তে মনোনিবেশ করলাম, যেন আপনি আমার এ উদ্দেশ্যে পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ, আমার অনুকূলে (আ)-এর সুপারিশ কবুল করুন। এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে হজরত আবু ইসহাক (র) বলেছেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ সহীহ।

দেখুন, দু'আটি কিয়ামত পর্যন্ত ধারপৃষ্ঠে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য শিক্ষার বিষয় বস্তুতে পরিণত হলো। এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান করা হয়েছে আর তাঁর সাহায্য ও প্রার্থনা করা হয়েছে।

'ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী' প্রথম খণ্ডের 'কিতাবুল হজ্জ' এর 'আদাবু যিয়ারতে কবরিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' শীর্ষক বর্ণনায় উল্লিখিত আছে–

ثم يقول السلام عليك يا نبى الله اشهد انك رسول الله ـ

অতঃপর নবীর রওযা যিয়ারতকারী ব্যক্তি বলবে হে নবী, আপনার প্রতি আমার সালাম, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি আল্লাহ রাসূল। এর পর লিখা হয়েছে–

ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله فى الغار ـ

যিয়ারতকারী এর পর বলবে 'ওহে রাসূলুল্লাহর সত্যিকার খলিফা, আপনার প্রতি সালাম; ওহে রাসূলের গুহার সঙ্গী, (সওর নামক পাহাড়ের গুহায় সহাবস্থানকারী) আপনার প্রতি আমার সালাম।' এর পর আরও লিখা হয়েছে:

فيترد السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الاسلام السلام عليك يا مكسر الاصنام ـ

যিয়ারতকারী এরপর বলবে 'ওহে মুসলমানদের আমীর, আপনার প্রতি সালাম, ওহে ইসলামের প্রকাশ্যে ঘোষণকারী, আপনার প্রতি সালাম, ওহে মূর্তি নিধনকারী আপনার প্রতি সালাম, (রা)।' এখানে দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ডাকা হয়েছে আর তাঁরই পার্শ্বদেশে শায়িত হজরত সিদ্দীক ও ফারুক (রা)-কেও ডাকার বিধান রাখা হয়েছে। এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন ব্যক্তিবর্গ, আওলিয়ায়ে মিল্লাত, মাশায়েখও বুযুর্গানে দ্বীনও তাঁদের দু'আ ও নির্ধারিত পাঠ্য ওয়াযীফাসমূহেও 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সম্বোধন করে থাকেন। যেমন– 'কসীদায়ে বোর্দা' শরীফে আছে–

يااكرم الخلق مالى من الوذبه

سواك عند حلول الحادث العمم

হে সৃষ্ট জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত সত্তা, আপনি ব্যতীত আমার এমন কেউ নেই, যার নিকট ব্যাপক বিপদাপদে আশ্রয় নিতে পারি।

হজরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) তাঁর কাসীদায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আহ্বান করেছেন এভাবে–

يارحمد للعالمين ادرك لزين العابدين

محبوس ايدى الظالمين فى اموكى المزدهم

হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওই যয়নুল আবেদীনের সাহায্যে এগিয়ে আসুন, যে জালিমের ভিড়ের মাঝে তাদের হাতে বন্দী হয়ে কাটাচ্ছে–

স্বনামধন্য আল্লামা জামী (র) বলেছেন–

زمهجورے برامدجان عالم: ترحم يا نبى الله ترحم

نه اخر رحمة للعالمين: زمحرو ماں چرافارغ نشينى

আপনার বিরহ-বেদনায় সৃষ্টি জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হে আল্লাহর নবী, আমাদের প্রতি রহম করুন, দয়ার ভাণ্ডার খুলে দিন। কেন, আপনি

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সারা পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ নন কি? আমাদের কত বঞ্চিত ও পাপীদের প্রতি এত বিমুখ হয়ে রয়েছে কেন?

হজরত ইমাম আবু হানীফা (র) স্বীয় 'কসীদায়ে নু'মানের' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আহ্বান করেছেন এভাবে–

ياسيد السادات جئتك قاصدا

ارجو رضاك واحتمى بحماك

ওহে সর্দারদের সর্দার, হৃদয়ে দৃঢ় আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়েছি এবং নিজেকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি।

এসব কবিতায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আহ্বান করা হয়েছে, তাঁর সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এ আহ্বান করা হয়েছে দূর থেকে তাঁর মৃত্যুর পর। সকল মুসলমান নামাযে বলেন–

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ـ

ওহে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও 'বরকতসমূহ' আপনার প্রতি বর্ষিত হোক! নামাযে তাঁকে এভাবে ডাকা 'ওয়াজিব' বা আবশ্য কর্তব্য। এ 'আততাহিয়াতু' প্রসঙ্গে 'হাযির-নাযির' এ আলোচনায় সুবিখ্যাত 'ফত্ওয়ায়ে শামী' ও 'আশআতুল লমআত' গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতিসমূহ পূর্বেই পেশ করেছি।

এতক্ষণ পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হলো এককভাবে 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলা সম্পর্কে। যদি অনেক মানুষ সমবেত হয়ে সমবেত কণ্ঠে 'নারায়ে-রিসালাত' ধ্বনি তোলে, তবে তা'ও জায়েয। কারণ, যখন এককভাবে 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্' বলা জায়েয, তখন এক সঙ্গে সবাই মিলে বলাও জায়েয হবে। কয়েকটি 'মুবাহ' (যে সক কাজ করলে কোনো পুণ্য নেই, না করলেও কোনো পাপ নেই, সে সব কাজ মুহাব)। কাজকে একত্রিত করলে সমষ্টিও 'মুবাহ' বলে গণ্য হবে। যেমন বিরানী 'হালাল।' কারণ তা হচ্ছে কয়েকটি হালাল দ্রব্যাদির সমষ্টি মাত্র।

অধিকন্তু, সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আহ্বান করার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণও আছে।

'মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে 'হাদীসুল হিজরত' শিরোনামের অংশে হজরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা ত্যাগ করে মদীনা শরীফের প্রান্তসীমায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে কিভাবে স্বাগত জানোন হয়েছিল তার বিবরণ হাদীসের ভাষায় শুনুন–

فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون يامحمد يا رسول الله يامحمد يارسول الله ـ

তখন মদীনার নারী-পুরুষ ঘরের ছাদসমূহের উপর চড়েন, ছোট ছোট ছেলে ও ক্রীতদাসগণ মদীনার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়েন, সবাই 'ইয়া মুহাম্মদ', 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন।

মুসলিম শরীফের এ হাদীসে 'নারায়ে রিসালাত' ধ্বনি তোলার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। জানা গেল যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম নারায়ে রিসালাতের ধ্বনি তুলেতেন। এ হাদীসে হিজরতে একথাও এসেছে যে, সাহাবায়ে কিরাম 'জুলুস' ও বের করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো ভ্রমণ থেকে মদীনা শরীফে ফিরে আসতেন, তখন মদীনা বাসীগণ তাঁকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে জুলুস' বের করতেন। (মিশকাত ও বুখারী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ্য যে, আরবি 'জলসা' শব্দের অর্থ হলো বৈঠক তথা উপবেশন। এ শব্দটির বহুবচন হচ্ছে 'জুলুস', যেমন 'জলদাহ' শব্দের বহু বচন হচ্ছে 'জুলুদ' অর্থ হলে বেত্রাঘাত তখন দোররা নামে অভিহিত। নামাযও আল্লাহর যিকরের 'জলসা' একই স্থানে বসে সম্পন্ন করা হয়। আর হজ্জ হচ্ছে যিকরের 'জুলুস' এক বৈঠকে সম্পন্ন করা যায় না, বরং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে সম্পন্ন করতে হয়। কুরআন থেকে দলিল পাওয়া যায় যে, 'তাবুতে সকীনা' (বনী ইসরাইলের অতি বরকমতমণ্ডিত 'সমশাদ' গাছ নির্মিত একটি বাক্স, যেখানে হজরত মূসা ও হারুন (আঃ)-এর লাঠি পাগড়ি, পাদুকা ও বস্ত্রাদি রক্ষিত ছিল)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরর শুভ জন্মক্ষণেও মিরাজের রজনীতে ফিরিশতাগণ তাঁর সম্মানার্থে 'জুলুস' বের করেছিলেন। সৎ ও পূত মাখলুকের অনুকরণ করাও পুণ্য কাজ। কাজেই, বর্তমানে জুলুসের যে প্রচলন আছে, তা পূর্বসুরীদের অনুকরণ বিধায় একটি পুণ্য কাজ।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাব

১. কুরআন মাজীদে এসেছে–

ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضرك -

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু ডেকো না, যা তোমার লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। এ থেকে জানা গেল যে, খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা নিষেধ। অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

এরা খোদা ব্যতীত অন্য কিছুকে ডাকে, যা তাদের উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না। (সূরা: ফুরকান– ৫৫)

সুতরাং, প্রমাণিত হলো, খোদা ছাড়া অন্যকে ডাকা মূর্তিপূজারীদের কাজ।

উত্তর: এ প্রকারের আয়াতসমূহ যেখানে دعا দুআ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ দুআ শব্দ দ্বারা ডাকার কথ বুঝানো হয়নি, বরং শব্দটির লক্ষ্যার্থ হলো পূজা করা (তাফসীরে জালালাইন ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।) এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করো না। দ্বিতীয় আয়াতটি এ লক্ষ্যার্থের প্রতি সমর্থন যোগাচ্ছে। প্রতিপালক আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেন–

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ -

(যে বা যারা খোদার সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে (পূজা করে).... । এ থেকে বুঝা গেল, খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে খোদা মনে করে ডাকাটা 'শিরক'। কারণ এতে খোদা ভিন্ন অন্যের ইবাদত বুঝা যায়। যদি এ সব আয়াতের লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা না হয়, তবে সে সব আয়াত, হাদীস ও উলামায়ে দ্বীনের উক্তিসমূহ, যা ইতঃপূর্বে পেশ করেছি, যেখান খোদা ছাড়া অন্যকে ডাকা হয়েছে, সবই শিরকে পর্যবসিত হবে। জীবিতকে ডাকা হোক, বা মৃতকে ডাকা হোক, সর্বাবস্থায় 'শিরক' বলে গণ্য হবে। দৈনিক আমরা ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদেরকে ডাকা-ডাকি করি। তাই, বিশ্বে কেউ শিরক থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অধিকন্তু, 'শিরক' বলা হয় খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে

খোদার সত্তা ও গুণাবলীতে অংশীদার গণ্য করাকে। কাউকে ডাকলে বা আহ্বান করলে খোদার কোনো গুণে অংশীদার করা হচ্ছে? এবং তা শিরক হবে কেন?

২. কুরআনে এসেছে–

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ -

(দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় 'আল্লাহকে স্মরণ করো) এ থেকে জানা গেল যে, উঠতে-বসতে খোদা ব্যতীত অন্য কারো নাম জপ করা শিরক; একমাত্র আল্লাহরই যিকর করা উচিত। (সূরা: আন-নিসা– ১০৩)

উত্তর ঃ এ আয়াতে হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিকরকে হারাম বা শিরক জ্ঞান করা অজ্ঞতার নামান্তর। উক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, নামায আদায় করার পর তোমরা যেকোন অবস্থায়, যে কোনোভাবে খোদার যিকর করতে পারবে। অর্থাৎ, নামাযে নির্ধারিত নিয়মাবলী পালনের দরকার ছিল ওযু ছাড়া নামায হবে না, সিজদা, রুকু, বসা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না এবং বিনা কারণে বসে শোয়ে আদায় করা যাবে না। তবে নামাযের আচার অনুষ্ঠান যখন সমাধা হয়ে যাবে, তখন এত সব নিয়মাবলী পালনের প্রয়োজন আর থাকছে না এখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্ববাস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবে।

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

ক. এ আদেশাত্মক আয়াতে فَاذْكُرُوا اللَّهَ "আল্লাহকে স্মরণ করো"-যে আদেশটি দেয়া হয়েছে, তা কাজটির আবশ্যকতা জ্ঞাপনের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়নি, কেবল কাজটির বৈধতার জ্ঞাপনার্থে আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নামায ছাড়া অন্য সময় খোদাকে স্মরণ করা, বা খোদাকে ভিন্ন অন্য কাউকে স্মরণ করা অথবা একদম নিশ্চুপ থাকা সব কিছুর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

খ. আয়াতের এ আদেশটিকে আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থে ধরে নিলেও খোদা ব্যতীত অন্য কারো জিকর নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে না। কারণ, খোদা ছাড়া অন্য কারো যিকরের সঙ্গে খোদার যিকরের 'বিরুদ্ধে বিরোধিতামুলক সম্পর্ক নেই; বরং আল্লাহর যিকরের

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সঙ্গে বিরুদ্ধ বিরোধতামূলক সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর যিকর না করার (দুটি বিরুদ্ধ বিরোধিতামূলক বিষয়ের প্রথমটি সত্য হলে, দ্বিতীয়টি মিথ্যা হবেই। আবার দ্বিতীয়টি মিথ্যা হলে প্রথমটি সত্য হবে অনিবার্যরূপেই।)

গ. আল্লাহর যিকর ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের যিকর এ বিষয় দুটিতে তর্কের খাতিরে যদি বিরোধিতামূলক সম্পর্ক রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বিষয় দুটির একটি ওয়াজিব হবার কারণে অপরটি অন্তত হারাম হবে, শিরক হবে না। খেয়াল রাখতে হবে যে হারাম বা ফরয হওয়া এগুলো 'কর্মেরই' বৈশিষ্ট্য, কর্মের না-বাচক সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য নয়।

ঘ. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিকর পরোক্ষভাবে খোদার যিকর হিসেবে গণ্য।

কুরআন ঘোষণা করছে–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের ফরমাবরদারি করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।" (সূরা: আন-নিসা– ৮০)

কালেমা, নামায, হজ্জ, দরূদ, খুতবা ও আযান মোটকথা যাবতীয় ইবাদতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিকরের অন্তর্ভুক্ত ও জরুরি। এখন নামাযের পরে অন্য কোনো সময়ে উঠতে বসতে তাঁর যিকর হারাম হবে কেন? যে ব্যক্তি উঠতে বসতে সবসময় দরূদ শরীফ বা কালেমা পাঠ করে, সে হুজুরেরই যিকর করছে এবং সে জন্য সওয়াবের ভাগী হচ্ছে।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ সূরায় মুনাফিকুন ও অপরাপর আয়াত যেখানে কাফিরদের বা তাদের প্রতিমাসমূহের উল্লেখ আছে, সে সব সূরা ও আয়াত পাঠ করা আল্লাহর জিকির, তা আল্লাহর যিকর। কেননা সেগুলো কুরআনের আয়াত। কুরআনী আয়াতের প্রতিটি অক্ষরের জন্য সওয়াব নির্ধারিত, যদিও বা সেসব আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর হল কাফিরগণ বা তাদের

প্রতিমা। কারণ, তা আল্লাহরর বাণী। কিন্তু এ কোন্ ধরনের ইনসাফ, আল্লাহর কালামের যিকর আল্লাহর যিকর রূপে গণ্য হবে, আর রহমতে এলাহী তথা নূরে এলাহী মুহাম্মদত রাসূলুল্লাহ যিকর আল্লাহর যিকরে গণ্য হবে না? কুরআনে আছে, قَالَ فِرْعَوْنُ অর্থাৎ, 'ফিরাউন বলল'। এখানে 'কালা' শব্দটি পড়লে ৩০টি সওয়াব এবং 'ফিরাআউন' শব্দটি পাঠ করলে ও ৫০টি সওয়াব লাভ হবে। কারণ প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে ১০টি সওয়াব নির্ধারিত। এখন লক্ষ্য করুন, কুরআনে ফেরাউনের নাম পাঠ করা হলে সওয়াব হবে ৫০, আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর নাম নিলে 'মুশরিক' হতে হয়-এ কোন প্রকারের যুক্তি?

হজরত ইয়াকুব (আ) পুত্র হজরত ইউসুফ (আ)-এর বিচ্ছেদ বেদনায় শোকাহত হয়ে উঠতে বসতে সদা হজরত ইউসুফের নাম নিতেন এবং তাঁরই শোকে এত অধিক কান্নাকাটি করেছেন যে, তার চোখ দু'টি সাদা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ হজরত আদম (আ) হজরত হাওয়ার বিরহ ব্যথার বিবি হাওয়া নাম জপ করতেন, হজরত যয়নুল আবেদীন (রা) স্নেহময় পিতার হজরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শোকে উঠতে বসতে পিতার নাম নিতেই থাকতেন। আর তাঁর শোকাহত অবস্থা যেন ব্যথাতুর হয়ে ফুলে উঠত:

حال من درهجر والد كمتر از يعقوب نيست
اوپسر گم كرده بود دومن پدر گم كرده ايم

অর্থাৎ, পিতৃশোকে আমার অবস্থা হজরত ইয়াকুব (আ)-এর শোকাহত অবস্থার চেয়ে কম নয়। তবে তিনি হারিয়েছেন পুত্র, আর আমি হারিয়েছি পিতাকে।

এখন বলুন, তাঁদের উপর শিরক-এর বিধান প্রযোজ্য হবে কি না? যদি প্রযোজ্য না হয়, তাহলে যে আশেকে নবী নিজের নবীর নাম স্মরণ করেন, তিনি মুশরিক হবেন কেন? একজন ব্যবসায়ী দিন-রাত তার ব্যবসার কথাই উল্লেখ করে। আর জ্ঞানীন্বেষী ছাত্র দিন-রাত সবসময় নিজের পাঠের কথা স্মরণ করে। তারা তো খোদা ছাড়া অন্য কিছুর নাম জপ করেছ, তারা মুশরিক নয় কেন?

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. বুখারী শরীফ ২য় খণ্ডে كتاب الاستيذان باب بحث مصافحة الاخذ باليدين এর অধ্যায়ে হজরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে 'আততাহিয়াত' তাশাহুদ' পাঠে শিখিয়েছেন–

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته -

হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক। এর পরে আছে:

فلما قبض قلنا السلام عليه يعنى على النبى صلى الله عليه وسلم -

অর্থাৎ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেসালের পরে আমরা 'আততাহিয়াত' পড়ার সময় বলেছি, নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উক্ত বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনী'-তে এ হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فظاهرها انهم كانوا يقولون السلام عليك بكاف الخطاب فى حيات النبى عليه السلام فلما مات تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي -

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ হাদীসের অর্থ হয়, সাহাবায়ে কিরমাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ইহকালীন জীবনে সম্বোধন করেই বলতেন 'আস্‌সালামু আলাইকা' অর্থাৎ, আপনার প্রতি সালাম। আরও পরিষ্কারভাবে, তাঁরা আরবি কর্মবাচক মধ্য পুরুষের শব্দ ব্যবহার করতেন। তবে যখন নবীর বেসাল হয়ে গেল, তখন তঁরা মধ্যম পুরুষের কর্মবাচক শব্দটি ব্যবহারের রীতি বর্জন করে তদস্থানে নাম পুরুষের ব্যবহার শুরু করলেন, আর বলতে লাগলেন 'আস্‌সালামু আলান নবীয়ে' অর্থাৎ, নবীর প্রতি সালাম।

উক্ত হাদীস ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের ইবারত থেকে জানা যায় যে, তাশাহুদ পাঠে 'আস্‌সালামু আলাইকা' বলা হতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবদ্দশায়। তাঁর বেসালের পর তাশাহুদ পাঠে তাঁকে সম্বোধনের রীতি বর্জিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম যেহেতু তাশাহুদ

পাঠে নবীকে উদ্দেশ্যে করে ডাকার রীতি পরিহার করেছিল, সেহেতু কেউ নামাযের বাইরে 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' প্রভৃতি বলে নবীকে সম্বোধন করলে সে পুরোপুরি মুশরিকরূপে গণ্য হবে।

উত্তর: বুখারী শরীফ ও 'আইনীর উক্ত ইবারত আপনাদের মতেরও বিপরীত। কারণ, আজ পর্যন্ত কোনো মুজতাহিদ ইমাম 'তাশাহুদ (আততাহিয়াত) পরিবর্তন করার আদেশ দেননি। ইমাম আবু হানিফা (র) গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত তাশাহুদ, আর ইমাম শায়েঈ (র) নিয়েছেন হজরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত তাশাহুদ। উভয় তাশাহুদে "আস্‌সালামু আলাইকুম আইয়ূহান নবীইয়ু" ইবরাতটুকু উল্লিখিত হয়েছে। লা-মাযহাবীরাও ছনায়ী দলভুক্ত হোক বা গজনবী দলভুক্ত এ সম্বোধন পদ সংবলিত তাশাহুদ পাঠ করে থাকে। কাজেই বুখারী, ও আইনীর ইবারত থেকে জানা যাচ্ছে যে, অনেক সাহাবী স্বীয় ইজতিহাদ (গবেষণা) অনুযায়ী 'তাশাহুদ পরিবর্তন করেছিলেন, তবে 'হাদীসে মরফু'র মুকাবিলায় সাহাবীর নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিষয় ঠিক নয়। (যে হাদীসের বর্ণনাকরীদের সূত্রে অব্যাহতভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বিস্তৃত, সে হাদীসকে হাদীসে মরফু বলা হয়)।

আবার সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা পরিবর্তন করেছিলেন, তারা এ জন্য পরিবর্তন করেননি যে অদৃশ্য বা অনুপস্থিত সত্তাকে সম্বোধন করা হারাম। নতুবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবদ্দশায় দূরে বসবাসকারী সাহাবায়ে কেরাম এ সম্বোধন পদ (হে নবী) সংবলিত তাশাহদ পড়তেন না। সুদূর ইয়ামন, খাইবর, মক্কা মুকাররমা, নজদ ও ইরাকের সব জায়গায় নামায পড়া হতো। সব স্থানে সে একই তাশাহুদ পাঠ করা হতো। অদৃশ্য তথা অনুপস্থিত সত্তাকে সম্বোধন করার প্রচলন সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেজাযে বসবাস করছিলেন আর হেজাযসমূহ অন্যান্য সব স্থানে সম্বোধন পদ সংবলিত তাশাহুদ পাঠ করা হচ্ছিল। সে প্রসঙ্গে না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছিলেন, না সাহাবায়ে কিরাম কোনো সংশয় প্রকাশ করেছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাশাহুদের ইবারত শিখানোর কালে একথা বলেননি, 'এ তাশাহুদ কেবল

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার পবিত্র ইহকালীন সময়ের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য; আমার বেসাল শরীফের পর অন্যভাবে তা পাঠ করো।'

উত্তরের সারমর্ম হলো, কয়েকজন সাহাবীর এ পরিবর্তনের কাজ প্রমাণ হতে পারে না। নতুবা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আমলে শিরক হচ্ছিল, কিন্তু তা নিষেধ করা হয়নি। আর পরবর্তীকালে সাহাবীদের কেউ কেউ পরিবর্তন করেছিলেন, সবাই করেননি এ ব্যাপারে 'মিরকাত' গ্রন্থের 'তাশাহুদ' শীর্ষক অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদের শেষে বলা হয়েছে–

واما قول ابن مسعود كنا نقول الخ فهو رواية ابى عوانة ورواية البخارى اصح فيها بينت ان ذلك ليس من قول ابن مسعود بل من فهم الروى عنه ولفظها فلما قبض قلنا سلام يعنى على النبى فقوله قلنا سلام يحتمل انه اراد به استمر رنا على ماكنا عليه فى حياته -

অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ (রা) যে বলেছেন, 'আমরা বলতাম.... সেটি হল আবু আওয়ানার বর্ণনা। এ প্রসঙ্গে বুখারীর রিওয়ায়ত অধিকতর বিশুদ্ধ। সেখানে বলা হয়েছে যে, কথাটি ইবনে মাসউদ (রা)-এর উক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা হল বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি। ইবন মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত উক্তিটি ছিল এরূপ: 'যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেসাল হয়ে গেল, তখন বলেছিলাম 'সালামুন' অর্থাৎ, নবীর প্রতি।' তাঁর এ যে উক্তি 'আমরা বলেছিলাম সালাম, এ উক্তির অপর অর্থ হওয়ার ও সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত তিনি একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা নবীর জীবদ্দশায় যেভাবে পাঠ করতাম। সেভাবে পড়ার রীতি চিরকালের জন্য চালু রাখলাম।

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম 'তাশাহুদের' ইবারত মোটেই পরিবর্তন করেননি। পরিবর্তনের যে কথাটি বলা হয়েছিল, তা' ছিল হাদীস বর্ণনাকারীর কেবলই ব্যক্তিগত বোধোদয়, আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয়।

৪. ওহাবী মতাদর্শের কেউ কেউ বলেন যে, নবী কিংবা ওলীকে দূর থেকেও ধারণার বশবর্তী হয়ে আহ্বান করা যে, তিনি আমার আওয়াজ শুনছেন। 'শিরক'। কারণ, দূরের আওয়াজ শ্রবণ খোদারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, খোদা ভিন্ন অন্য কারো মধ্যে এ ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করা শিরক। অবশ্য হ্যাঁ, যদি এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করা না হয়, তাহলে ইয়া রাসূলুল্লাহ্ 'ইয়া গাউস' ইত্যাদি বলা বৈধ, যেমন বায়ুকে সম্বোধন করে বলা হয়ে থাকে "ওহে প্রভাত সমীরণ শুনো।" এখানে এরূপ কোনো ধারণা করা হয় না যে, বাতাস শুনছে। ইদানীং ওহাবী মতাবলম্বীগণ এ অজুহাতে খাঁড়া করে থাকেন।

উত্তর: দূরের আওয়াজ শ্রবণ মোটেই আল্লাহর গুণ নয়। দূর থেকে তো তিনিই শুনেন, যিনি আহ্বানকারী থেকে দূরে অবস্থান করেন। তবে মহাপ্রতিপালক শাহরগের চেয়েও নিকটতর। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন–

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ -

আমি তার শাহরগের চেয়েও নিকটতর। আরও বলেছেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ -

যখন আমার বান্দাগণ আমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দিবেন, যে, আমি নিকটে বিরাজমান। অন্যত্র বলা হয়েছে–

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ -

আমি এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট তোমাদের চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। (সূরা: আল-ওয়াকিয়া– ৮৫)

স্পষ্টই বুঝা গেল যে, মহাপ্রতিপালক আল্লাহ নিকটের আওয়াজই শুনেন, তার জন্য প্রতিটি আওয়াজই নিকটের, কারণ তিনি স্বয়ং নিকটেই বিদ্যমান। আর যদি এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, দূরের শব্দ শ্রবণ তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাহলেও স্বীকার করতে হয় যে, নিকটের আওয়াজ শ্রবণও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই কাছের কাউকে শ্রোতা মনে করে আহ্বান করা যাবে না, কারণ এতে মুশরিক হয়ে যাবে। তাই সবাইকে বধির মনে করতে হয়।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধিকন্তু দূরের আওয়াজ শ্রবণ যেমন খোদার গুণ, তেমনি দূরের বস্তু দেখা ও দূরের ঘ্রাণ পাওয়া আল্লাহর অন্যতম গুণ। 'ইলমে গায়েব' ও 'নাযির-নাযিরের' তুল্য। তাদের দর্শনেন্দ্রিয় যদি দূরের ও কাছের বস্তুকে একইভাবে দেখতে পায়, তবে তাদের শ্রবন্দ্রিয় ও দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনলে 'শিরক' হবে কেন? খোদার প্রদত্ত গুণ তাঁরা লাভ করেছেন। এখন আমি প্রমাণ করছি যে, নবী ও গুণীগণ দুরের শব্দ শুনেন।

হজরত ইয়াকুব (আ) সুদূর কেনানে (লেবানন) বসে হজরত ইউসুফের (আ) জামায় খুশবু পেয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন– إنى لاجد ريح يوسف আমি হজরত ইউসুফের (আ) ঘ্রাণ পাচ্ছি। এবার বলুন, এ শিরক হল কি না? হজরত উমর (রা) মদীনা শরীফ থেকে হজরত সারিয়া (রা)-কে যিনি সুদূর নেহাওয়ান্দ নামক স্থানে যুদ্ধরত ছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন, আর হজরত সারিয়া (রা) সে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। (মিশকাত শরীফের 'কারামাত' শীর্ষক অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। দেখুন, হজরত ফারুক (রা) এর চোখ দূর থেকে দেখেছে আর হজরত সারিয়া (রা)-এর কান দূর থেকে শুনছে। তাফসীরে রুহুল বায়ান, জালালাইন, মাদারেক ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ– واذن فى الناس আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইবরাহীম (আ) পবিত্র কাবা ঘর তৈরি করে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত রূহের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছিলেন হে আল্লাহর বান্দাগণ, চলুন। কিয়ামত অবধি যেসব রূহ মধ্যে আগমন করবে সকলেই সে আওয়াজ শুনেছিল। যেসব রূহ তাঁর ডাকে লাব্বাইক (আমি উপস্থিত আছি) বলেছেন, সে সব রূহ অবশ্যই হজ্জ করার গৌরব অর্জন করবেন। আর যে সব রূহ সে সময় নিশ্চুপ ছিল, তারা কখনও হজ্জ করতে পারবে না। চিন্তা করুন, এখানে শুধু দূর থেকে নয়, বরং ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সবাই হজরত খলীল (আ)-এর শব্দ শুনেছে। এখন এটি শিরক হল কি না? অনরূপ, হজরত ইবরাহীম খলীল (আ) মহান প্রভুর দরবারে আরজ করেছিলেন হে মওলা, তুমি মৃত্যুকে কিরূপে জীবন দান করবে, তা আমাকে দেখিয়ে দাও।' তখন আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ এল চারটি পাখিকে জবাই করে এদের মাংসগুলো চারটি পাহাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও– ثم ادعهن ياتينك سعيا এর পর পাখিগুলোকে

ডাকো, ডাকের সঙ্গেই সেগুলো দৌড়ে এসে যাবে। লক্ষ্য করুন, মৃত পাখিগুলোকে ডাকা হল, পাখিগুলো ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ে এসে পড়ল, আল্লাহর ওলীগণ কি ওসব প্রাণীর চেয়েও অধম? মৃত প্রাণীগুলো শুনতে পায়, আর আল্লাহর ওলীগণ দূরের আওয়াজ শুনেন না। ইদানীং একজন লোক লন্ডনে বসে টেলিফোনের মাধ্যমে ভারতে অবস্থানরত লোকের সাথে কথা বলতে পারে। সে ভারতীয় মানুষকে এ বিশ্বাস রেখেই ডাকে যে, ভারতীয় লোকটি উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে তার কথা শুনতে পায়। এর ডাকাটা শিরক কি না? যদি কোনো মুসলমান এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, নবুওয়াতের শক্তি টেলিফোনের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি এবং তাই আম্বিয়ায়ে কিরাম খোদাপ্রদত্ত শক্তি বলে প্রত্যেকের শব্দ শুনেন, আর এ বিশ্বাসের বলে আল্লাহর রাসূলকে এ বলে আহ্বান করে 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলগিয়াস' (হে আল্লাহ রাসূল! ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শুনুন ও সাহায্য করুন।) তবে এভাবে ডাকা শিরক হবে কেন? হজরত সুলাইমান (আঃ) একবার এক সফরে যাবার সময় দূর থেকে জঙ্গল একটি পিঁপড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। পিঁপড়ার রানী অন্যান্য পিঁপাড়াদের লক্ষ করে বলছিল–

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ـ

ওহে পিঁপড়া সব, তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে পড়ো, যেন হজরত সুলাইমান (আ) ও তাঁর লোকজন তাদের অজান্তে অবলীলাক্রমে তোমাদরকে পদদলিত না করেন (সূরা: আন-নামাল– ১৮)

তাফসীরের রূহুল বয়ান ও অন্যন্য তাফসীর গ্রন্থসমূহেও এ আয়াতের ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে, হজরত সুলাইমান (আ) তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ার এ শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। এখন চিন্তা করুন, পিঁপড়ার আওয়াজ, তা-ও তিন মাইল দূর থেকে। বলুন, এটা শিরক হলো কি না? মিশকাত শরীফের 'ইছবাতু আযাবিল কবর' শীর্ষক অধ্যায়ে এসেছে মৃত ব্যক্তি দাফনের পর কবর থেকে বাহিরের লোকের পদ ধ্বনি শুনতে পায়, যিয়ারত কারীদেরকে দেখে ও চিনতে পারে। এ জন্য কবরস্থানের গিয়ে কবরবাসীদেরকে সালাম দেয়া চাই। লক্ষ করুন, এতটুকু মাটির নিচে থেকে এত ক্ষীণ শব্দ শ্রবণ কত দূরের আওয়াজ শুনার সমতুল্য? বলুন,

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এটি শিরক হল কি না? আল্লাহর ওলীগন খোদায়ী শক্তিতে দেখেন, শুনেন ও স্পর্শ করেন। যাঁকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দান করেন, তিনি যদি দূর থেকে শুনতে পান তা শিরক হবে কেন?

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূরের বস্তু দেখতে পাই, রেডিও টেলিফোন দিয়ে দূরের আওয়াজ শুনতে পাই। নূরে নবুওয়ত ও বেলায়েতের শক্তি কি বিদ্যুৎ শক্তির অপেক্ষা দুর্বল?

এসব প্রসঙ্গে ভিন্নমতবলম্বীগণ এথাই বলবেন যে, আল্লাহ তাদেরকে শুনিয়ে দেন বিদায় তারা শুনেছিলেন। আমরাও তো এজন্য বলছি নবীও ওলীগণকে খোদা দূরের আওয়াজ শুনান, তাই তাঁরা শুনতে পান। খোদা তা'আলার এ শ্রবণ ক্ষমতা সত্তাগত, আর তাদের এ গুণ খোদাপ্রদত্ত। আল্লাহর এ গুণ হচ্ছে চিরন্তন, আর তাঁদের এ গুণ অচিরন্তন। খোদার এ গুণ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, আর ওদেরকে এ গুণ খোদার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ শ্রবণ করেন কান ও অপর কোনো অঙ্গের সাহায্য ব্যতিরেকে আর তাঁরা শুনেন কান দ্বারা। এ শ্রবণের ক্ষমতার প্রাকৃতিতে এতটুকু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'শিরক' হয় কিরূপে?

কুফর

কুফরের আভিধানিক অর্থ হল, ঢেকে ফেলা ও নিশ্চিহ্ন করা। এ জন্য অপরাধের শরয়ী সাজাকে কাফ্ফারা বলা হয়। কারণ কাফফারা গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। একটি ওষুধের নাম কাফুর, কর্পুর স্বীয় উগ্র সুঘ্রাণ দ্বারা অন্যান্য ঘ্রাণকে আচ্ছন্ন ফেলে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান–

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

যদি তোমরা বড় গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো, তবে আমি তোমাদের ছোট গুনাহসমূহ মাফ করে দিব এবং তোমাদেরকে উত্তম জায়গায় প্রবেশ করাব। (সূরা: আন-নিসা– ৩১)

কুরআন শরীফে এ كفر শব্দটি কয়েকটি অর্থে এসেছে। যেমন– অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকার, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ـ

যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে তোমাদেরকে আরও অধিক দেব আর যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমার কঠিন শাস্তি রয়েছে। (সূরা: ইবরাহীম– ৭)

واشكروالى ولاتكفرون ـ

আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না।

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ـ

ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে বলল, তুমি নিজের কাজটা করেছ, যেটা করেছ। তুমি অকৃতজ্ঞ। (সূরা: শুআরা– ১৯)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুফর অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ـ

যে ব্যক্তি শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে মজবুত হাতল ধরল। (সূরা: আল-বাকারা– ২৫৬)

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ـ

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওই দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যকে অভিশাপ দিবে। (সূরা: আল-আনকাবুত- ২৫)

وكانو بعبادتهم كافرين -

এসব বাতিল উপাসকরা তাদের উপাসনার অস্বীকারকারী হবে।

এসব আয়াতে কুফর অস্বীকার অর্থে এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون -

বলে দিন, হে কাফিরেরা আমি তোমাদের উপাসকদের পূজা করি না।

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ -

সুতরাং সেই কাফির (নমরুদ) আশ্চর্য হয়ে গেল। (সূরা: আল-বাকারা- ২৫৮)

والكفرون ثم الظلمون -

কাফিরেরা হলো অত্যাচারী।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ -

ওরা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলেছে- ঈসা ইবনে মরিয়ম হল আল্লাহ। (সূরা: আল-মায়িদাহ- ১৭)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ -

বাহানা করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। (সূরা: আত-তাওবাহ- ৬৬)

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ -

তাদের মধ্যে কতেক ঈমান এনেছে আর কতেক কাফির রয়ে গেছে। (সূরা: আল-বাকারা- ২৫৩)

এ রকম আরও অনেক আয়াত আছে, যেখানে কুফর শব্দটি ঈমানের মুকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ বেঈমান হয়ে যাওয়া, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। ঈমানের মুকাবিলায় এ কুফর সব বিষয়ে প্রয়োগ হবে অর্থাৎ যেসব বিষয়গুলো মান্য করা ঈমান, ওগুলো থেকে যেকোনো

একটাকে অস্বীকার করাটাও কুফর। কাজেই কুফরী নানা প্রকারে হতে পারে। আল্লাহকে অস্বীকার করা, আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার তথা শিরক করাও কুফরী। অনুরূপ ফেরেশতা, জান্নাত-দোযখ, হাশর-নশর, নামায-রোযা, কুরআনের আয়াত, এক কথায় দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোনো একটি বিষয় অস্বীকার করা কুফর। এ জন্য কুরআন শরীফে নানা ধরনের কাফিরদের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

কুফরের বাস্তবতা: যদিও-বা অনেক কিছুকে মানার নাম ঈমান, তবে ওসব কিছুর মূলে রয়েছে নবীকে মান্য করা। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণভাবে মান্য করল, সে সব কিছু মেনে নিল। অনুরূপ কুফরও মূলত একটি বিষয়ের উপর নির্ভর। তা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আজমত ও শান-মানকে অস্বীকার করা। এটাই হল কুফরীর মূল, অন্যগুলো এর শাখা-প্রশাখা। যেমন আল্লাহর সত্তা বা গুণাবলিকে অস্বীকারকারী আসলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অস্বীকারকারী। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ এক আর এ বলছে আল্লাহ দুই। এ রকম নামায-রোযা ইত্যাদি কোন একটির অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে হুযুরকে অস্বীকার বুঝায়। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ সব বিষয় ফরয আর সে বলে ফরয নয়। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সামান্য বেআদবী বা তাঁর কোন কিছুর প্রতি সামান্য অবজ্ঞা, কুরআনের ফতওয়া মোতাবেক কুফরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا - اولئك هم الكافرون حقا - وللكافرين عذات اليم -

ওসব কাফিরেরা বলে আমরা কতেক পয়গম্বরের প্রতি ঈমান আনব এবং কতেককে অস্বীকার করব। তারা চায় যে ঈমান ও কুফরের মাঝখানে কোন পথ আবিষ্কার করতে। এ সব লোক নিঃসন্দেহে কাফির। কাফিরদের জন্যই রয়েছে কঠিন আযাব।

والذين يوذون رسول الله لهم عذاب عليم -

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন আজাব।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে কাফিরদের জন্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এতে প্রমাণ হয়, সেই প্রকৃত কাফির, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয় আর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাঁর খেদমত ও আনুগত্য করে, সে খাঁটি মুমিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছে ও তাঁকে সাহায্য করেছে, তারা খাঁটি মুসলমান। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক রয়েছে। (সূরা: আল-আনফাল- ৭৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ -

তারা কি জানে না, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত, সদাসর্বদা সেখানে থাকবে। এটা বড় জিল্লতী। (সূরা: আত-তাওবাহ- ৬৩)

উল্লেখ্য যে, যে উত্তম কাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য প্রকাশ পায় না বরং বিরোধিতা প্রকাশ পায়, তা কুফরী হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে যে খারাপ কাজে হুযুরের আনুগত্য প্রকাশ পায়, সেটা ঈমান হিসেবে গণ্য। যেমন মসজিদ তৈরি করা ভালো কাজ। তবে মুনাফিকরা যখন হুযুরের বিরোধিতা করার জন্য মসজিদে জেরার তৈরি করল, তখন কুরআন সেটাকে কুফরী সাব্যস্ত করল। কালামে পাকে বর্ণিত আছে-

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ

যারা মসজিদ তৈরি করেছিল ক্ষতিসাধন ও কুফরীর জন্য এবং মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করার সুযোগের জন্য, তারা পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী। (সূরা: আত-তাওবাহ- ১০৭)

নামায ভঙ্গ করা গুনাহ তবে হুযুরের ডাকে নামায ভঙ্গ করা গুনাহ নয় বরং ইবাদত হিসেবে গণ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ -

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে আহ্বান করে। কেননা সেটা তোমাদেরকে জিন্দেগী দান করে।

এ জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আওয়াজ থেকে উঁচু আওয়াজ করা আর হুযুরের প্রতি সামান্য বেআদবী করাকে কুরআন কুফরী ঘোষণা করেছে। শয়তান যথেষ্ট ইবাদত করেছিল তবে যখন আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বলল-

انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين - قال فاخرج منها فانك رجيم

আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা আর তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি অভিশপ্ত হয়ে গেছ।

এতে সঙ্গে সঙ্গেই শয়তান কাফির হয়ে গেল।

ফিরাউনের যাদুকরেরা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মানপূর্বক যাদু করার পূর্বে আরয করেছিল-

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ -

হে মূসা, প্রথমে কি আপনি নিক্ষেপ করবেন, নাকি আমরা ফেলব? (সূরা: আল-আরাফ- ১১৫)

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ অনুমতি নেওয়ার সম্মান দেখানোর ফল এটাই হলো যে এক দিনেই তাদের ঈমান, কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালামের সাহচর্য, তাকওয়া, সবর ও শাহাদত লাভ হল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান– فالقى السحرة ساجدين (যাদুকরদেরকে সিজদায় পতিত করা হলো।)

অর্থাৎ তারা নিজেরা সিজদায় পতিত হয়নি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পতিত করা হয়েছে। কাফিরদের অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানবোধ সৃষ্টি হলে, ইনশা আল্লাহ মুমিন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন বেআদবী রোগে আক্রান্ত হয়, তবে ঈমানহারা হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা অপরাধী ছিলেন কিন্তু বেআদব ছিলেন না। এজন্য তাঁদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস সালামের ছেলে কাবিল শুধু অপরাধ নয়, নবীর সঙ্গে বেআদবীও করেছিল। তা এ কারণে পরিণতি ভালো হয়নি।

শিরক

شرك (শিরক) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অংশ। তা এ কারণে অংশীদারকে শরিক বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ام لهم شرك فى السموات والارض -

ওসব মূর্তিদের কি আসমান-জমীনে অংশ আছে?

هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم -

আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, সেখানে তোমাদের অধীন গোলামদের মধ্যে কেউ কি অংশীদার, যেন তোমরা বরাবর হয়ে যাও। ওসব গোলামদেরকে তোমরা এ রকম ভয় করো, যেমন নিজের জীবনের ব্যাপারে ভয় করো।

رجلا فيه شركاء ورجلا سلما لرجل هل يستويان -

একজন ওই রকম গোলাম যার কয়েকজন সমান অংশীদার (মালিক) আছে এবং একজন ওই রকম গোলাম, যে শুধু এক ব্যক্তির অধীন। এ দু'জন কি সমান?

উল্লিখিত আয়াতসমূহে شرك ও شريك শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ অংশ ও অংশীদার বুঝানো হয়েছে। কাজেই শিরকের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কাউকে খোদার সমান মনে করা। কুরআন শরীফে শিরক শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের আয়াতসমূহে شرك কুফর অর্থে এসেছে।

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء -

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছে মাফ করে দিবেন।

ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا -

মুশরিকদেরকে বিবাহ করো না, যে পর্যন্ত ঈমান না আনে।

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ -

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুমিন গোলাম মুশরিক থেকে উত্তম। (সূরা: আল-বাকারা- ২২১)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ -

মুশরিকদের এ অধিকার নেই যে, তাদের কুফরীর দাবি করে আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে। (সূরা: আত-তাওবাহ- ১৭)

এ আয়াতসমূহে শিরক দ্বারা প্রত্যেক কুফর বুঝানো হয়েছে। কারণ কোনো কুফরই ক্ষমার যোগ্য নয় এবং কোনো কাফিরের সঙ্গে মুমিন নারীর বিবাহ জায়েয নেই। প্রত্যেক মুমিন যেকোনো কাফির থেকে উত্তম, চাই সে মুশরিক হোক যেমন হিন্দু অথবা অন্য কেউ যেমন ইহুদী, পারসিক, মজুসী ইত্যাদি।

অপর অর্থে শিরক মানে কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা, তা কুফর থেকেও জঘন্য। প্রত্যেক শিরক কুফর কিন্তু প্রত্যেক কুফর শিরক নয়। যেমন প্রত্যেক কাক কালো কিন্তু প্রত্যেক কালো বস্তু কাক নয়, প্রত্যেক স্বর্ণ চকচকে কিন্তু প্রত্যেক চকচকে জিনিস স্বর্ণ নয়। নাস্তিক ব্যক্তি কাফির কিন্তু মুশরিক নয় তবে হিন্দু কাফির এবং মুশরিকও। কুরআন শরীফে শিরক শব্দটি প্রায় এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا -

তারা দু'জন ওই নেয়ামতে আল্লাহর সমান করে দিয়েছে, যেটা আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। (সূরা: আর-আরাফ- ১৯০)

حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ..

আমি যাবতীয় মন্দ ধর্ম থেকে অসন্তুষ্ট এবং আমি মুশরিকদেরকে অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা: আল-আনআম- ৭৯)

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

নিঃসন্দেহে শিরক বড় জুলুম। (সূরা: লোকমান- ১৩)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ -

তাদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, ওরা মুশরিক। (সূরা: ইউসূফ- ১০৬)

এ রকম অসংখ্য আয়াতে শিরক শব্দটি আল্লাহর বরাবর মনে করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিরকের হাকীকত: কাউকে আল্লাহ পাকের সমপর্যায়ের জ্ঞান করাই শিরকের মূল। অর্থাৎ যতক্ষণ কাউকে আল্লাহর সমান মনে করা না হয়, ততক্ষণ শিরক হবে না। এজন্যই কিয়ামতের দিন কাফিরেরা তাদের মূর্তিদেরকে বলবে-

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

আল্লাহর কসম, আমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিলাম। কারণ তোদেরকে রব্বুল আলামীনের বরাবর মনে করতাম। (সূরা: শুয়ারা- ৯৭-৯৮)

এ বরাবর জানার কয়েকটি ধরন রয়েছে-

এক. কাউকে খোদার স্বজাত জানা। যেমন খ্রিস্টানেরা ঈসা আলাইহিস সালামকে এবং ইহুদীরা উজাইর আলাইহিস সালামকে খোদার পুত্র জ্ঞান করত, আরবের মুশরিকেরা ফেরেশতাগণকে খোদার কন্যা মনে করত। যেহেতু সন্তান পিতার স্বজাত ও সমপর্যায়ের হয়ে থাকে, সেহেতু এ রকম ধারণা পোষণকারীরা মুশরিক। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ -

এসব লোকেরা বলে থাকে যে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ এর থেকে পবিত্র বরং এরা হল আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। (সূরা: আল-আম্বিয়া- ২৬)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

ইহুদীরা বলে উজাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানেরা বলে মসিহ আল্লাহর পুত্র । (সূরা: আত-তাওবাহ- ৩০)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ -

ঐ লোকেরা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করে নিয়েছে। নিশ্চয় মানুষ একেবারে অকৃতজ্ঞ। (সূরা: আয-যুখরুফ- ১৫)

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ -

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরা আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাগণকে মহিলা সাব্যস্ত করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টির কালে উপস্থিত ছিল? (সূরা: আয-যুখরুফ- ১৯)

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ -

তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে মেয়েদেরকে গ্রহণ করেছেন আর তোমাদেরকে ছেলেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন? (সূরা: আয-যুখরুফ- ১৬)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে কিন্তু তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য না জেনেই পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করেছে। (সূরা: আল-আনআম- ১০০)

لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى -

এসব কাফিরেরা ফেরেশতাগণের নাম মহিলাদের নামের ন্যায় রাখত। (সূরা: আন-নজম- ২৭)

এ রকম অসংখ্য আয়াতে এ ধরনের শিরক বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর সন্তান মনে করা।

দুই, কাউকে আল্লাহর ন্যায় সৃষ্টিকর্তা মনে করা। যেমন আরবের কতেক কাফিরের বিশ্বাস ছিল যে ভালো কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং মন্দ কোনো কিছুর সৃষ্টিকর্তা হল অন্য প্রভু। এখনও পারসিকরা এ ধরনের বিশ্বাস করে- মঙ্গলের সৃষ্টিকর্তাকে ইয়াযদান আর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তাকে আহরমান বলে। এটা সেই পুরানো শিরকী বিশ্বাস। পক্ষান্তরে কতেক কাফির বিশ্বাস করত যে, তারা নিজেরাই নিজেদের মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা। তাদের মতে খারাপ জিনিস সৃষ্টি করা খারাপ। এজন্য এর সৃষ্টিকর্তা অন্য কেউ। এ ধরনের মুশরিকদের অভিমত খণ্ডনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। স্মর্তব্য যে খ্রিস্টানেরা তিন খোদায় বিশ্বাসী ছিল, যার মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অন্যতম। এ সবের খণ্ডনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ও তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা: আস-সফফাত- ৯৬)

الله خالق كل شئ وهو على كل شيئ وكيل -

আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুর ক্ষমতাবান।

خلق الموت والحيوة خلق السموات ولارض ومافيهن وهو على كل شئ قدير -

আল্লাহ তায়ালা হায়াত-মউত সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান ও যমীনসমূহ এবং এতদুভয়ের মধ্যকার জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ -

নিশ্চয়ই ওই সকল লোক কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে যে মরিয়মের পুত্র মসিহ হলেন আল্লাহ। (সূরা: আল-মায়িদাহ- ১৭)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالث ثلثة -

নিশ্চয়ই ওই সকল লোক কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে আল্লাহ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا -

যদি যমীন-আসমানের মধ্যে এক খোদা ব্যতীত অন্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ে গণ্ডগোল করত। (সূরা: আল-আম্বিয়া- ২২)

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ -

এটা আল্লাহর মখলুক (সৃষ্টি)। কাজেই এ ছাড়া তোমরা কি সৃষ্টি করেছ, তা আমাকে দেখাও। (সূরা: লোকমান- ১১)

এ রকম সব আয়াতে দ্বিতীয় প্রকারের শিরকের কথা বলা হয়েছে এবং এর খণ্ডন করা হয়েছে। যদি এসব মুশরিকরা গায়রুল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস না করত, তবে ওসব মাবুদদের সৃষ্টিকর্ম দেখানোর কথা বলাটা সঠিক হতো না।

তিন. যুগকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা আর আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। আরবের অনেকে মুশরিকদের এ বিশ্বাস ছিল। বর্তমান যুগে প্রকৃতবাদীরাই হল তাদের উত্তরসূরী। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারা বলে, ওটা কিছুই না, আমাদের দুনিয়াবী জীবন মাত্র। আমরা জীবিত থাকি ও মৃত্যুবরণ করি। যুগ ব্যতীত অন্য কেউ আমাদেরকে ধ্বংস করে না। তাদের এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই।

এ ধরনের প্রকৃতিবাদীর অভিমত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে সে সব আয়াত উল্লেখযোগ্য, যে সব আয়াতে বলা হয়েছে– পৃথিবীর আশ্চর্যকর জিনিসগুলোর প্রতি মনোযোগ সহকারে দেখুন। এ সব মহা বিজ্ঞানসম্মত জিনিসগুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না।

يغشى الليل النهار ان ذالك لايت لقوم يتفكرون -

রাত দিনকে ঢেকে ফেলে। এর মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য গবেষণার অনেক নিদর্শন রয়ে গেছে।

ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايت لاولى الالباب -

নিশ্চয় ভূমণ্ডল নভোমণ্ডল সৃষ্টি এবং দিন-রাত বড় ছোট হওয়ার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ - وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

আস্থাশীলদের জন্য পৃথিবীর মাঝে অনেক নিদর্শন রয়েছে। স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই নিদর্শন রয়েছে। তোমরা এসব কখো না কেন? (সূরা: আয-যারিয়াত– ২০-২১)

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ -

তারা কি উটের দিকে দেখে না, কিভাবে একে সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমানের প্রতি তাকায় না, কি রকম উঁচু করা হয়েছে। পাহাড়ের দিকে দেখে না, কেমনভাবে স্থাপিত করা হয়েছে, এবং যমীনের দিকে দেখে না, কিভাবে বিছানো হয়েছে। (সূরা: আল-গাসিয়া– ১৬-২০)

এ ধরনের বিশটি আয়াতে ও ধরনের প্রকৃতি পূজারীদের অভিমত রদ করা হয়েছে।

চার. আল্লাহকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা মনে করা। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও পোষণ করা যে তিনি একবার সৃষ্টি করার পর দুর্বল হয়ে গেছে।

এখন কোনো কাজে সক্ষম নয়, অন্যান্য মাবুদরা এখন তাঁর খোদায়ী কর্ম পরিচালনা করছে। এ প্রকারের মুশরিকরা নানা অদ্ভুত কথা বলত। তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ ছয় দিনে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিন দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে বিশ্রাম নিয়েছেন। এখনও সেই বিশ্রামে আছেন। ফেরকায়ে তাতিলিয়া এ ধরনের মুশরিকদের স্মৃতিবাহক। নিম্নের আয়াতসমূহ তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ -

আমি আসমান-যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, এবং আমাকে দুর্বলতা স্পর্শ করেনি। (সূরা: ক্বফ– ৩৮)

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে দুর্বল হয়ে গেছি। মূলত তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দিহান। (সূরা: ক্বফ– ১৫)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ -

তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করে দুর্বল হননি। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতেও সক্ষম। (সূরা: আল-আহকাফ– ৩৩)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ -

আল্লাহর শান হল, যখন তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন 'হয়ে যাও' বলেন। এতে সেটা হয়ে যায়। (সূরা: ইয়াসীন– ৮২)

এ ধরনের মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডনে এ রকম অসংখ্য আয়াত আছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোনো প্রকারের ক্লান্তি বোধ হয়নি। এ ধরনের মুশরিক কিয়ামতের অস্বীকারকারী হওয়ার এটা একটি অন্যতম কারণ যে তারা ভাবত, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া একবার সৃষ্টি করে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। তাই আবার কি করে সৃষ্টি করবেন। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে আমি কেবল 'হয়ে যাও' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কিছু হয়ে যায়। তাই ক্লান্ত কিসের? আমি পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে অধিক ক্ষমতাবান। আবিষ্কারের চেয়ে পুনঃনির্মাণ অধিক সহজ।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাঁচ. এ প্রকারের মুশরিকদের বিশ্বাস হলো প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু তিনি এত বড় সাম্রাজ্য একাকী সামাল দিতে অক্ষম। এ কারণে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে কতেককে তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। যেমন দুনিয়াবী বাদশাহ তাঁর রাজ্য পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশাসক নিয়োগ করে থাকেন। যেসব বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করেছেন, তাঁরা বান্দা হলেও আল্লাহর উপর বিশেষ প্রভাব রাখেন। তাঁরা আমাদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ করলে, আল্লাহ মানতে বাধ্য হন। কাজেই তাঁরা আমাদের যেকোনো সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। যেমন সংসদের সদস্যরা যদিও-বা রাষ্ট্র প্রধানের অনুগত কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সবের দখল থাকে। আরবের অনেকেই এ প্রকারের শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের মূর্তি– ইয়াগুছ, লাত মানাত, উজ্জা ও অন্যান্য মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সহায়তাকারী বান্দা বলে বিশ্বাস করে আল্লাহকে পুরো জগতের সৃষ্টিকর্তা মনে করেও মুশরিক ছিল। এ বিশ্বাসে কাউকে ডাকা, শাফায়াতকারী মনে করা, হাজত পূর্ণকারী ও মুশকিল আসানকারী মনে করা, ওর সামনে মাথানত করা, সম্মান করা, সবই শিরক। মোট কথা আল্লাহর সঙ্গে সমপর্যায়ের ধারণা করে যা কিছু করা হবে, সবই শিরক হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে বলেন–

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ـ

ওসব মুশরিকদের মধ্যে অনেকেই এ রকম আছে যে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। তবে শিরক করে।

অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতা মান্য করার পরও তারা মুশরিক। (সূরা: ইউসূফ– ১০৬)

এ পঞ্চম প্রকার মুশরিকদের সম্পর্কে নিম্নের আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ـ

যদি আপনি ওসব মুশরিকদেরকে নিকট জানতে চান যে আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্য কে অনুগত করেছেন? তারা বলবে– আল্লাহ। তখন আপনি বলুন, তবে কেন ভুলে যাচ্ছ? (সূরা: আল-আনকাবুত– ৬১)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ـ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ـ

জিজ্ঞেস করুন, প্রত্যেক কিছুর রাজত্ব কার হাতে? যিনি পানাহ দেন এবং যাকে পানাহ দেয়া হয় না। যদি তোমরা তা জেনে থাক, তাহলে বলবে আল্লাহর হাতে। জিজ্ঞেস করুন, তথাপি তোমরা যাদুর প্রতি মুহিত কেন? (সূরা: আল-মুমিনুন– ৮৮-৮৯)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ـ

যদি আপনি ওদেরকে প্রশ্ন করেন যে আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তখন ওরা বলবে ওগুলোকে অধিক জ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। (সূরা: আয-যুখরুফ– ৯)

قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ـ سيقلون لله قل افلا تذكرون ـ

আপনি বলুন, তোমরা যদি জান, তবে বলো দেখি যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এগুলো কার? তারা বলবে আল্লাহরই। তখন আপনি বলুন, তবে তোমরা নসীহত কেন গ্রহণ করছ না?

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ـ سيقلون لله قل افلا تتقون ـ

বলুন, সাত আসমান ও মহা আরশের প্রভু কে? তারা বলবে সবই আল্লাহ। আপনি বলুন, তবে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো না কেন?

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিজ্ঞাসা করুন, আসমান-যমীম থেকে তোমাদেরকে খাবার কে দেয়? বা চোখ-কানের সৃষ্টিকর্তা কে? এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে এবং কাজসমূহের প্রতিভা কে সৃষ্টি করে? তারা জবাব দিবে– আল্লাহ। তখন আপনি বলুন, তবে তোমরা ভয় করছ না কেন? (সূরা: ইউনুস– ৩১)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ -

যদি আপনি ওদেরকে প্রশ্ন করেন যে আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছে। এরপর মৃত যমীনকে জীবিত করেছে? তখন তারা বলবে– আল্লাহ করেছেন। (সূরা: আল-আনকাবুত– ৬৩)

এ রকম অসংখ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে এ প্রকারের মুশরিকরা আল্লাহকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবিতকারী, মৃত্যু দানকারী, আশ্রয় দানকারী, বিশ্ব পরিচালনাকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি কেন মুশরিক ছিল? এ প্রশ্নের জবাব কুরআন মজিদে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন যে ওদের এসব বিশ্বাসের পরও দুটি কারণে মুশরিক ছিল– তারা খোদাকে বিশ্বের একক মালিক মনে করত না বরং আল্লাহর সাথেও অন্যদেরকে মাবুদ মনে করত। উপরিউক্ত আয়াতসমূহে لله শব্দের ل বর্ণটি দ্বারা মালিকত্ব উদ্দেশ্য অর্থাৎ ওরা আল্লাহকে মালিক মনে করত তবে একক মালিক মনে করত না বরং তারা অন্য মাবুদদেরও বিশ্বাসী ছিল। এ জন্য ওরা এ রকম বলত না যে মালিকত্ব ও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারো নেই। বরং তারা বলত যে, আল্লাহ এবং অন্যদেরও মালিকত্ব ও হস্তক্ষেপ করার শক্তি রয়েছে। দ্বিতীয়ত তারা মনে করত যে আল্লাহ এসব কাজ একাকী করত না বরং ওদের মূর্তিদের সাহায্য নিয়ে করত। আল্লাহ ওদের সাহায্য নিতে বাধ্য ছিল। নিম্নের আয়াতসমূহে তাদের উপরিউক্ত বিশ্বাস দুটি খণ্ডন করা হয়েছে:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا -

আপনি বলে দিন, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি নিজের জন্য সন্তান তৈরি করেননি, না আছে তাঁর সাম্রাজ্যে কোনো শরীক, কোনো

দুর্বলতার দরুন না আছে তাঁর কোনো সাহায্যকারী। তাই তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। (সূরা: বনী ইসরাঈল– ১১১)

যদি ওসব মুশরিকরা মালিকত্ব ও হস্তক্ষেপে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অংশীদার মনে না করত, তবে এভাবে খণ্ডন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

জাহান্নামে মুশরিকরা তাদের মূর্তিদেরকে বলবে– আল্লাহর কসম, আমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ঠতায় ছিলাম। কারণ, আমরা তোমাদেরকে প্রভুর বরাবর মনে করতাম। (সূরা: শুআরা– ৯৭-৯৮)

যদি মুশরিকরা মুসলমানদের মত আল্লাহকে অন্য কারো শরীক ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা, মালিক মনে করত, তাহলে বরাবর মনে করার কী অর্থ হতে পারে?

ام لهم الهة تمنعهم من دوننا لايستطيعون نصرانفسهم ولاهم منا يصحبون

তাদের কি এমন কিছু দেবতা রয়েছে, যারা তাদেরকে আমার থেকে রক্ষা করতে পারবে? ওরা তো নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আমার পক্ষ থেকে ওদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

এ আয়াতে মুশরিকদের উক্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে ওদের দেবতা আল্লাহর মুকাবিলায় ওদেরকে রক্ষা করতে পারে।

ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لايملكون شيئا ولايعقلون - قل لله الشفاعة جميعاله ملك السموات والارض -

বরং তারা আল্লাহর মুকাবিলায় কিছু সুপারিশকারী তৈরি করে রেখেছে। আপনি বলুন, যদিও-বা ওগুলো কোনো কিছুর মালিক না হয় আর জ্ঞান না রাখে? আপনি বলে দিন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর হাতে।

এ আয়াতে মুশরিকদের উক্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে যে ওরা মনে করত ওদের দেবতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া জবরদস্তি সুপারিশ করে ওদেরকে আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করতে পারে। এ কারণে এ আয়াতে মূর্তিগুলোর মালিকত্ব না থাকার কথা আর আল্লাহর মালিকত্বের কথা বর্ণিত

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাজ্যে এমন কোন অংশীদার নেই, যে অংশীদারের দাবি নিয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারে।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ -

ওরা আল্লাহ ব্যতীত ওসব জিনিসের পূজা করে, যেগুলো ওদের লাভ-ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। ওরা বলে যে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (সূরা: ইউনূস- ১৮)

এ আয়াতেও মুশরিকদের উক্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে যে ওরা মনে করত যে, ওদের মূর্তিগুলো আল্লাহর কাছে জোরালো সুপারিশ করবে। কারণ ওগুলো আল্লাহর রাজ্যে এবং রাজ্য পরিচালনায় আল্লাহর অংশীদার।

মোটকথা হলো আরবের মুশরিকদের শিরক একই রকম ছিল না বরং ওদের মধ্যে পাঁচ ধরনের শিরক ছিল। (১) সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার এবং যুগকে বিশ্বাস করা, (২) কয়েক খোদা মনে করা, (৩) আল্লাহকে এক মনে করে। তবে তাঁর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করা, (৪) আল্লাহকে এক মনে করে। তবে ক্লান্ত হয়ে অন্য মাবুদের সাহায্য গ্রহণকারী মনে করা, (৫) আল্লাহকে খালেক-মালেক স্বীকার করে, অবশ্য অন্যদের মুখাপেক্ষী মনে করা। অন্যদেরকে আল্লাহর রাজত্বে ও প্রভূত্বে জড়িত মনে করা। এ পাঁচ ধরনের শিরক ব্যতীত অন্য আর কোনো প্রকারের শিরক প্রমাণিত নেই। এ পাঁচ ধরনের মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদা কুরআন মাজীদে রদ করা হয়েছে। এ পাঁচ ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন সূরা ইখলাসে এভাবে এসেছে- قل هو الله (বলল, আল্লাহ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা) দ্বারা প্রকৃতি পূজারীদের ধারণা খণ্ড করা হয়েছে, احد (এক) দ্বারা ওই সব মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে, যারা দুখোদার বিশ্বাস করতো, لم يلد ولم يود (তাঁর কোন সন্তান নেই আর তিনি কারো সন্তান নন) দ্বারা ওসব মুশরিকদের বিশ্বাস রদ করা হয়েছে, যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত উজাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে জানত, ولم يكن له كفوا احد (তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই) দ্বারা ওসব মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে, যারা সৃষ্টিকর্তাকে পরিশ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে অন্যান্য দেবতাদেরকে বিশ্ব পরিচালনাকারী ভাবত।

আপত্তি- ১: আরবের মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে শুধু খোদার নিকট সুপারিশকারী এবং খোদাপ্রাপ্তির অসিলা বলে বিশ্বাস করত। মুসলমানেরাও তো নবী-ওলীগণকে সুপারিশকারী ও অসিলা ভাবত। কিন্তু ওরা মুশরিক হয়ে গেল আর এরা মুমিন রইল, এর কারণ কী?

জবাব: এতে দুটি কারণ আছে- এক. মুশরিকরা খোদার দুশমনদেরকে অর্থাৎ মূর্তি ইত্যাদিকে সুপারিশকারী ও অসিলা মনে করত, যা ঠিক নয়। আর মুসলমানগণ আল্লাহ মাহবুবগণকে সুপারিশকারী, অসিলা মনে করেন, যা ন্যায়সঙ্গত। তাই ওরা মুশরিক হয়ে গেছে আর এরা মুমিন রয়েছেন। যেমন গঙ্গার পানি, পাথরের তৈরি মূর্তির প্রতি সম্মান, হোলি, দেওয়ালী, বেনারস, কাশী ইত্যাদিকে সম্মান করা শিরক। তবে জমজমের পানি, হাজরে আসওয়াদ, মকামে ইবরাহিম, রমযান, মুহররম, মক্কা মুয়াজ্জমা, মদীনা তৈয়্যবার সম্মান প্রভৃতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অথচ জমজম ও গঙ্গার পানি উভয়টাই পানি এবং হাজরে আসওয়াদ ও পাথরের মূর্তি উভয়টা পাথর।

দুই. মুশরিকরা তাদের দেবতাদেরকে আল্লাহর মুকাবিলায় প্রভাবশালী সুপারিশকারী ও অসিলা মনে করত। তবে মুসলমানগণ নবী-ওলীগণকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে মনে করে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ সুপারিশকারী ও অসিলা মনে করেন। উল্লেখ্য যে অনুমতি ও মুকাবিলা যথাক্রমে ঈমান ও কুফরের পরিমাপক।

আপত্তি- ২: আরবের মুশরিকদের মুশরিক এ জন্য বলা হয় যে, তারা মখলুককে ফরিয়াদ গ্রহণকারী, বিপদমুক্তকারী, সুপারিশকারী, মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী, দূরের আহ্বান শ্রবণকারী, অদৃশ্য জ্ঞানী ও অসিলা জ্ঞান করত। ওরা তাদের মূর্তিদেরকে সৃষ্টিকর্তা মালেক, রিজিক দাতা, হায়াত ও মৃত্যুদানকারী মনে ভাবত না। আল্লাহর বান্দা মনে করেই এ পাঁচটি ক্ষমতা ওদের মধ্যে রয়েছে বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু কুরআনের ফতয়া দ্বারা ওরা মুশরিক হয়ে গেছে। তাই বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে যারা নবী ওলীগণের বেলায় উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করে, ওরাও ওদের ন্যায় মুশরিক বলে গণ্য হবে, যদিওবা ওনাদেরকে খোদার বান্দা (মখলুক) মনে করে উপরিউক্ত ধারণা পোষণ করে।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জবাব: এটা কেবল ভ্রান্ত ও কুরআনের অপব্যাখ্যা মাত্র। আল্লাহর সাথে বান্দাকে বরাবর মনে না করলে কিছুতেই শিরক হতে পারে না। মুশরিকরা তো মূর্তিগুলোকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত মনে করত। আর মুসলমানগণ নবী-ওলীগণকে আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর বান্দা ভেবে সাহায্যকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। তাই তারা মুমিন হিসেবে গণ্য। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের এসব গুণাবলি কুরআন কারীমে সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন– আমি আল্লাহর আদেশে মৃতদেরকে জীবিত, অন্ধ এবং কুষ্ঠরোগী ভালো করতে পারি। আমি আল্লাহর হুকুমে মাটির তৈরি পাখিকে ফুঁক দিয়ে জীবিত পাখি বানাতে সক্ষম। তোমরা ঘরে বসে যা খাও বা রেখে দাও, তা আমি বলতে পারব।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন– আমার জামা আমার আব্বাজানের চোখে লাগাবেন, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামকে বলেছেন– আমি আপনাকে সন্তান দিব।

এসব বক্তব্যে কোন মাধ্যম ছাড়া বিপদ মুক্তকরণ, হাজত পূরণ, অদৃশ্য জ্ঞান সব কিছু বান্দার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হলো। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ঘোড়ার পদধূলি গো-বাছুরের মূর্তির মাঝে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। এটাও মাধ্যমবিহীন জীবন দান। আবার হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি তারই হাত মুবারকের বরকতে মুহূর্তে জীবিত সাপ হয়ে যেত। হযরত আসফ চোখের পলক ফেলার আগেই ইয়ামন থেকে সিরিয়ায় বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে এসেছেন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তিন মাইলের দূর থেকে পিপীলিকার শব্দ শুনেছেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কেনানে অবস্থান করে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিসরে তালাবদ্ধ সাত কামরার সর্বশেষ কামরায় খারাপ ধারণা থেকে হেফাজত করেছেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম রূহগুলোকে হজ্জের জন্য আহবান করেছিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত রূহসমূহ শুনেছিলেন। এসব মুজিজা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

আপত্তিকারীদের মতে তো এসব শিরক। অথচ এগুলো কুরআন স্বীকৃত মুজিজা ও কারামত, যা কোনো মাধ্যম ছাড়া প্রমাণিত। যদি কোনো মাধ্যম ছাড়া হস্তক্ষেপ করা শিরক হয়ে যায়, তবে প্রত্যেক মুজিজা, কারামত স্বীকার করা শিরক হবে। কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ও নবী-ওলীগণের বিশ্বাসে ধন্য এ প্রকারের শিরককে আমরা মোবারকবাদ জানাই।

পার্থক্য হলো আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ এসব বিষয় বান্দার জন্য স্বীকার করা শিরক নয়, অবশ্য আল্লাহর মুকাবিলায় মান্য করা শিরক। নবী-ওলীগণের মুজিজা ও কারামত তো আছেই, আবার আজরাইল আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য ফেরেশতাগণ একই সময় সারা পৃথিবী অবলোকন করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় একই সময় হস্তক্ষেপ করেন। আল্লাহ তায়ালা ফরমান–

قل يتوفكم ملك الموت الذى وكل بكم -

আপনি বলে দিন, তোমরা সবাইকে মৃত্যুর ফেরেশতা মৃত্যু দান করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم -

শেষ পর্যন্ত যখন ওদের নিকট আমার মৃত্যুদূত আসবে, ওদেরকে মৃত্যুদান করার জন্য।

অভিশপ্ত ইবলিসকে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, সে ও তার বংশধররা গোমরাহ করার জন্য সবাইকে একই সময় দেখে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ফরমান–

انه يركم هو وقبيله من حيث لاترونهم -

সেই শয়তান ও তার বংশধর তোমরা সবাইকে ওখান থেকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা ওদেরকে দেখতে পাও না।

যে ফেরেশতাদ্বয় কবরে প্রশ্ন-উত্তর করেন, যে ফেরেশতা মায়ের পেটে সন্তান তৈরি করেন, তাঁরা সবাই দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং খোদাপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা রাখেন। অন্যথায় কোন মাধ্যম ব্যতীত এত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহর মুকাবিলায় এ শক্তি বিশ্বাস করাটাই শিরক। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও অনুমতি সাপেক্ষ এসব ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা একেবারে ঈমান সম্মত।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদয়াতের সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ

বিদয়াতের অর্থ বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহর ব্যাখ্যা মিরকাতুল মাফাতিহ কিতাবে এভাবে করা হয়–

اِنَّ الْبِدْعَةَ فِى اللُّغَةِ مَا كَانَ مُخْتَرَعًا عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ -

অর্থ: ওই সকল আবিষ্কৃত বস্তু বা কাজ যার পক্ষে ইতঃপূর্বে কোন নমুনা বা দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত আর এ অর্থই আল-কুরআনের নিম্ন আয়াতে এসেছে। যথা:

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ: আল্লাহ হলেন নমুনা বিহীন আসমান-জমিনের স্রষ্টা। আর বিদয়াতের পারিভাষিক অর্থ–

اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ: এমন কাজ আবিষ্কার করা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আমলে ছিল না। ফতহুল মুবীন গ্রন্থে উল্লেখ এসেছে–

قَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) مَا اُحْدِثَ وَمَا خَالَفَ كِتَابًا اَوْ سُنَّةً اَوْ اِجْمَاعًا اَوْ اَثَرًا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ - وَمَا اُحْدِثَ مِنْ خَيْرٍ لَّمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَهُوَ بِدْعَةٌ مَّحْمُوْدَةٌ - وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلٰى نُدْبِهَا وَهِىَ مَا وَافَقَ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ لِمَامَرَّ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ فِعْلِهِ مَحْذُوْرٌ شَرْعِىٌّ وَمِنْهَا مَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَتَصْنِيْفِ الْعُلُوْمِ -

বিদয়াতের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র) এর ভাষ্য নিম্নরূপ। যে কর্ম নব আবিস্কৃত এবং যা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও খায়রুল কুরুনের মতামত– এ বিষয় চতুষ্টয়ের যেকোনটির বিরোধিতাই বিদয়াতে দালালা তথা সাইয়্যেআহ। আর যে আবিষ্কৃত কর্ম উল্লিখিত বিষয় চতুষ্টয়ের কোনোটির বিরোধী নয়– তা-ই বৈধ অর্থাৎ বিদয়াতে হাসানা। তা করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ধরনের বাধা নেই। তন্মধ্যে কিছু ফরজে কেফায়াও রয়েছে। দ্বীনের উপকারার্থে বিভিন্নমুখী শাস্ত্র প্রণয়ন করা।

اَلْبِدْعَةُ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ فَقَدْ تَكُوْنُ وَاجِبَةً كَنَصْبِ الْاَدِلَّةِ لِلرَّدِّ عَلٰى اَهْلِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَتَعَلُّمِ النَّحْوِ الْمُفْهِمِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْدُوْبَةً كَاِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَّمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ اِحْسَانٍ لَّمْ يَكُنْ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَمَكْرُوْهَةً كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُبَاحَةً كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيْذِ الْمَاْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِىْ شَرْحِ جَامِعِ الصَّغِيْرِ لِلْمَنَاوِىِّ عَنْ تَهْذِيْبِ النَّوَوِىِّ وَبِمِثْلِهِ فِى الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِلْبَرْكَلِىِّ كذافى رد المحتار ج ١ ص ٥٦٠

অর্থ: বিদয়াত পাঁচ প্রকার। যথা: (১) ওয়াজিব– যেমন পথভ্রষ্ট ফেরকার মতবাদ বাতিল প্রতিপন্ন করার জন্য দলিলাদি পেশ করা, কুরআন ও সুন্নাহ বুঝবার উদ্দেশ্যে ইলমে নাহু শিক্ষা করা। (২) মানদুব– উত্তম বা পছন্দীয় বিদয়াত, যেমন মুসাফিরখানা ও মাদরাসা নির্মাণ করা এবং ঐ সব কল্যাণকর কাজ যা ইসলামের প্রথম আমলে ছিল না তা করা। (৩) মাকরূহ– যেমন মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা ও কারুকার্য করা (৪) মুবাহ– যেমন পানাহারে প্রাচুর্যতা অবলম্বন করা এবং পোশাক-পরিচ্ছদে জাঁকজমক শোভামণ্ডিত করা। (৫) মুহাররামা– যেমন শত্রুতামূলক মনোভাবের ভিত্তিতে নয়, বরং সন্দেহের বশে এমন কোন আমলের দিকে বৈধতার আকিদা তথা বিশ্বাস করা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণিত, সুপরিচিত সৎ আমলের বিরোধী। যেমন– মুতাযিলা, কদরিয়া, জাবারিয়া, মুরজিয়া, মুজাসসিমা, খাওয়ারিজ প্রভৃতি দলের অভ্যুত্থান বরং এসব বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করে ইসলামি শরীয়তকে রক্ষা করা ফরজে কিফায়া।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদয়াত দু'প্রকার– হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ

এ কথা সবার জনা যে, বিদয়াতে হাসানার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সকল ইমামের একই মত এবং তা ঐ বিদয়াত যা উল্লিখিত দলিল চতুষ্টয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে এবং যাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো প্রকার অনিষ্ট ও অমঙ্গলের সৃষ্টি না হয়। এ প্রকারের বিদয়াতসমূহ থেকে একটি বিদয়াত হলো ফরজে কিফায়া, যেমন, দ্বীনী ইলমের গ্রন্থাদি সংকলন এবং প্রণয়ন। আল-কুল্লিয়া নামক কিতাবে লিখিত রয়েছে–

اَلْوَاجِبَةُ مِنَ الْبِدْعَةِ نَظْمُ اَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَالْمُبْتَدِعِيْنَ لِلرَّدِّ

অর্থ: ওয়াজিব বিদয়াতসমূহ থেকে একটি হলো, আল্লাহবিরোধী ও বিদয়াতপন্থী লোকদের ভ্রান্ত মতবাদগুলির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য হকপন্থী মুতাকাল্লিম আলিমগণের দালিলিক যুক্তি-প্রমাণগুলো সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত করা। আন নেহায়াতুল আছীরাহ নামক গ্রন্থে এসেছে–

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ-بِدْعَةُ هُدًى وَّبِدْعَةُ ضَلَالٍ-فَمَا كَانَ فِيْ خِلَافِ مَا اَمَرَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه فَهُوَ فِيْ حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْاِنْكَارِ وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِيْ حَيِّزِ الْمَدْحِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَّه مِثَالٌ مَّوْجُوْدٌ كَنَوْعٍ مِّنَ الْجُوْدِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ فَهُوَ مِنَ الْاَفْعَالِ الْمَحْمُوْدَةِ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ فِيْ خِلَافِ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ نَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ لَه فِيْ ذٰلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه

اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَقَالَ فِيْ ضِدِّهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَذٰلِكَ اِذَا كَانَ فِيْ خِلَافِ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه وَرَسُوْلُه وَمَنْ ذٰلِكَ النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ (رض) نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِ لَمَّا كَانَتْ مِنْ اَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِيْ حَيِّزِ الْمَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً وَمَدَحَهَا نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنُّهَا لَهُمْ وَاَنَّهَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا

وَمَا كَانَتْ فِيْ زَمَانِ اَبِيْ بَكْرٍ (رض) وَاِنَّمَا جَمَعَ عُمَرُ (رض) النَّاسَ عَلَيْهِمْ وَنَدَبَهُمْ اِلَيْهَا فَلِهٰذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً

অর্থ: বিদয়াত দু'প্রকার (১) বিদয়াতে হুদা: অর্থ সঠিক ও কল্যাণকর বিদয়াত (২) বিদয়াতে দালালা: অবৈধ ও পথভ্রষ্টতামূলক বিদয়াত। যে কর্ম আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমের বিরোধিতাই অগ্রাহ্য ও তিরস্কারের শামিল। আর যে সব কাজ আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং যে সকল বিষয়ের প্রতি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে উৎসাহিত করেছেন তাই প্রশংসার যোগ্য ও কল্যাণকর। আবার যে কাজের শরীয়তে কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেমন দানশীলতা ও সৎকার্যাবলীর এমন কোনো দিক যার দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়নি এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে প্রসংশার যোগ্য ও মঙ্গলময়। অবশ্য এসব কাজ এমনভাবে সংঘটিত করা বৈধ হবে না যাতে শরীয়তের কোনো ঘোষণার বিরোধিতা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রকারের কাজে সওয়াব পাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন–

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَه كُتِبَ لَه مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا - رواه مسلم ج٢-٤٣ مشكوة

অর্থ: জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোনো চমৎকার মঙ্গলময় নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করবে সে ব্যক্তি ঐ নব আবিষ্কৃত পদ্ধতির বিনিময় ও সওয়াব তো পাবেই, আবার যারা সে সব সৎপন্থা অনুযায়ী আমল করবে তাদের সওয়াবেরও সে অধিকারী হবে। (সহীহ মুসলিম শরীফ)

অপরদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَه كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - رواه مسلم ج٢-٣٤ مشكوة ٣٣

অর্থ: যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোনো মন্দ পদ্ধতি বা কাজের প্রচলন ঘটাবে সে ব্যক্তি ঐ কাজের গুনাহ ও ঐ কাজের আমলকারীদের গুনাহের ভাগী হবে এবং তা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন ঐ কাজ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত মত ও পথের বিরোধী নয় তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা)-এর উক্ত ঘোষণাকে আওতাভুক্ত করা যায়, যা তিনি তারাবীহের জামায়াত সম্বন্ধে বলেছেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِه অর্থাৎ জামায়াতের সাথে তারাবীহের এ নামাযকে খুবই উৎকৃষ্ট বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত ওমর (রা) জামায়াত সহকারে তারাবীহের নাযামকে একটি মহৎ ও প্রশংসনীয় বন্দেগী রূপে উল্লেখ করে তা বিদয়াত নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতের সঙ্গে তারাবীহের নামায পড়ার প্রথা চালু করেননি। তিনি মাত্র কয়েক রাত্রি তারাবীহের নামায পড়েন। পরে তা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং লোকজনকে উক্ত নামাযের জামাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি। এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর আমলেও জামায়াতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার নিয়ম ছিল না। তা কেবল হযরত ওমর (রা) তাঁর খিলাফত কালে স্থানীয় মুসলমানদেরকে জামায়াত সহকারে তারাবীহ পড়তে আদেশ দেন। এজন্য এ তারাবীর জামায়াতকে উত্তম বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা নববী বলেছেন, বিদয়াত ওই কাজকে বলে যা পূর্ব নমুনার ভিত্তিতে করা হয়নি। শরীয়তের পরিভাষায় বিদয়াত ঐ কাজকে বলা হয় যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র আমলে ছিল না।

এবং হাদীসে বর্ণিত বাক্যটি–

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও কতিপয় বিদয়াত তা থেকে আলাদা। যাকে সুন্নাতে হাসানা তথা বিদয়াতে হাসানা বলা হয়। যথা– মিরকাত শরহে মিশকাত ১/২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.AmarIslam.com

সকল বিদয়াত সাইয়্যেয়াহ নয়

বিদয়াত শব্দ শুনলেই তথাকথিত কিছু সংখ্যক আলেম চমকে উঠেন। যেন হয় তাদের দৃষ্টিতে বিদয়াততুল্য খারাপ বস্তু ইসলাম ধর্মে আর অন্য কিছু নেই। তারা হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। যেমন–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - متفق عليه

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার ইসলামে এমন নতুন মত আবিষ্কার করবে যার সদন-দলিল কুরআন পাক ও হাদীস শরীফে প্রকাশ্যে পাওয়া যায় না তা বর্জনীয়।

উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় কাজী ইয়াজ উদ্দীন বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের মধ্যে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যার সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য তথা অপ্রকাশ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে অগ্রাহ্য হবে। আর كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ প্রসঙ্গে আজহার কিতাবে লিখিত আছে যে, এখানে বিদয়াত বলতে বিদয়াতে সাইয়্যেয়াহ উদ্দেশ্য। কেননা কতিপয় বিদয়াত মন্দ ও অবৈধ বিদয়াতের আওতা বহির্ভূত যা বিদয়াতে হাসানা নামে গণ্য।

আল্লামা নববী বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এমন এক ব্যাপক নীতিমূলক কথা যা থেকে কতিপয় দিক আলাদা। সব ধরনের বিদয়াতই ভ্রান্ত ও গোমরাহী নয় বরং কিছু বিদয়াত এমন আছে যেগুলো আমলের উপযোগী।

যেমন মহান খলীফা হারুনুর রশীদের বিদ্যোৎসাহী প্রধান মন্ত্রী নিযামুল মুলক শিক্ষাকে উন্মুক্ত করার জন্য একটি পাঠ্যসূচী তথা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেন যা দরসে নিযামী নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। তৎকালে বাগদাদ ইউনিভার্সিটিতে যা জামেয়া-ই নিযামীয়া নামে পরিচিত। উক্ত পাঠ্যসূচী মোতাবেক শিক্ষা কার্য পরিচালনা হতো।

উসূলে ফিকহের কিতাব নূরুল আনোয়ার ও উসূলুশ শাশীতে এ প্রসঙ্গে একটি মূলনীতি রয়েছে–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَا مِنْ عَامٍ اِلَّا خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ -

অর্থ: এমন কোনো ব্যাপক নীতি নেই যা থেকে কিছুটা খাস বা সীমাবদ্ধ করা হয়নি। কুরআনে এসেছে–

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا اُوْتِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ -

যাবতীয় বস্তুকে আল্লাহ পাকের নির্দেশে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এরূপ বিলকিস রাণিকে সর্বপ্রকার বস্তু দেয়া হয়েছে অথচ এর মধ্যে সব বস্তু অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে লেখক নিম্নলিখিত মতামত পেশ করতেছে। যা বিভিন্ন কিতাবের ভাষ্য হতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। বিদয়াত দুই ধরনের (হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ)। এতে বিরোধীদের মতের রদ বা অপনোদন হয়ে গেল বরং তারা ভ্রান্তির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত। কিন্তু জনগণ জানেন যে, চার মাজহাবের উদ্ভব যুগত্রয়ের পর, তদ্রূপ ইলমে মারেফতের বিভিন্ন তরীকা বিশেষত কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি তরীকাসমূহ যুগত্রয়ের পর উদ্ভাবিত হয়েছে।

মসজিদে মেহরাবের উৎপত্তি বনী উমাইয়্যাদের যুগে হয়েছে। মিম্বারের ৫/৭/৯ সিঁড়ি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ছিল না, তা পরবর্তী যুগে হয়েছে। কুরআন পাকে যের, যবর ও পেশ বিদ্যমান ছিল না। হাজ্জাজ বিন ইউসূফ হাকাফী এর ব্যবস্থা করেছেন।

সরকারী ও কওমী মাদরাসার অস্তিত্ব ছিল না তা পরবর্তী সময়ে হয়েছে। পীর-মুরীদীর বর্তমান পদ্ধতি সোনালি যুগে ছিলনা। অথচ বর্ণিত নিয়মনীতি কওমী ও সরকারি সকলে মান্য করে চলি। কেবল মিলাদের ব্যাপারে তাদের আপত্তি উঠে। তারা বলেন এ পদ্ধতি হুযুর পাকের আমলে ছিল না। আসুন! যাতে আজ থেকে সামনে আমরা উপকৃত হতে পারি। কেউ যেন এ নেক কাজ থেকে বিরত না থাকি, সমাজের নিরীহ জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি না করি। যদি মিলাদ মাহফিল করলে বেদাত হয়, তা হলে মাজহাব ও তরীকা কেন মান্য করা হবে যেখানে বিশ্বের ৭৫% মুসলমান সম্পৃক্ত।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন সকল মুসলমানদেরকে এ যুগের ঈমান নাশক ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড় থেকে যেন নিরাপদে রাখেন। –আমীন।

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ

সমাপ্ত

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক

সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

কর্তৃক প্রণীত ও অনূদিত প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

১. মারেফাতের গোপন ভেদ– লেখক: সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
২. সিরাতুল মুসতাকিম– লেখক: সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
৩. কিয়ামত অতি নিকটবর্তী– লেখক: সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
৪. কুরআন-হাদীসের আলোকে "অসিলা ও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ" –লেখক: সূফী মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
৫. আল মুনকেযু মিনাদ্দালাল– মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
৬. ক্বিসতাসুল মুসতাক্বীম– মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
৭. মিশকাতুল আনওয়ার– মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
৮. সৃষ্টির রহস্য– মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
৯. দিদারে এলাহী– মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
১০. সিয়াম সাধনা– মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
১১. কাশফুল মাহজুব– মূল: হজরত দাতা গঞ্জে বখশ হাজবেরী লাহোরী (র)
১২. দেওয়ানে শামসে তাবরীজ– মূল: আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (র)
১৩. আল-কওলুল জামিল– মূল: শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (র)
১৪. ফয়সালায়ে হাফতে মাসয়ালা– মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
১৫. জিয়াউল কুলুব– মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
১৬. সিররুল আসরার– মূল: বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র)

এবং আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থসমূহ প্রকাশের অপেক্ষায়।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com